ভে ত রে

আমেরিকান ... তোয়াজ বন্ধ কর ... ২

তেলেঙ্গানার আত্মপ্রকাশ ও তার প্রতিক্রিয়া ... ৩

... শহীদ সরোজ দত্ত স্মরণ ... ৪

আত্মত্যাগের অমর কথা ঃ গদর আন্দোলন ... ৫

সরোজ দত্তের প্রবন্ধ—শিল্প-সাহিত্যে ৬

ব্র্যাডলে ম্যানিং—স্পর্ধিত নায়ক ... ৭

আজকের দেশব্রতী

₹২

পত্রিকা প্রকাশিত হয় প্রতি বৃহস্পতিবার,

পৃষ্ঠা সংখ্যা ৮

বার্ষিক গ্রাহক — ১০০ টাকা

(৪৮টি সাধারণ সংখ্যা ও একটি বিশেষ সংখ্যা)

যান্মাসিক গ্রাহক — ৫০ টাকা (২৬টি সংখ্যা)

১০টি বার্ষিক গ্রাহক একত্রে জমা দিলে প্রতি সংখ্যায় ১টি পত্রিকা বিনামূল্যে

খণ্ড ২০ সংখ্যা ২৮ ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী-লেনিনবাদী)-র পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির মুখপত্র ৮ আগস্ট ২০১৩

তেলেঙ্গানা-গোর্খাল্যাণ্ড

উত্তাল দক্ষিণ থেকে উত্তর

অন্ধ্রপ্রদেশের তেলেঙ্গানা অঞ্চলে স্বাধীনতা পরবর্তী সময় থেকেই বৃহদাংশের মানুষ বুর্জোয়া রাষ্ট্রকাঠামোর মধ্যে আঞ্চলিক সম্পদের ওপর অগ্রাধিকারের প্রেক্ষিতে কৃষ্ণা-কাবেরী নদীর জলবণ্টনে অসাম্য, বাজেট বরাদ্দের স্বল্পতা, বিদ্যুতের অপ্রতুলতা, সর্বোপরি রাজনৈতিক স্বতন্ত্রের দাবিতে সোচ্চার থেকেছে। সুতরাং এই অঞ্চলের বঞ্চনার বিপ্রতীপে আলাদা রাজ্য গঠনের দাবি অত্যন্ত যৌক্তিক একটি দাবি। কংগ্রেস শাসিত অন্ধ্রপ্রদেশে ৪২টি লোকসভা আসনের মধ্যে তেলেঙ্গানার ১০টি জেলা সম্বলিত অঞ্চল থেকে লোকসভায় প্রতিনিধির সংখ্যা ১৭। দাবিটিকে দীর্ঘদিন ঝুলিয়ে রাখলে দুকুল থেকেই বৃহদাংশের আসনই হাতছাড়া হওয়ার আশঙ্কায় কংগ্রেস দলীয় বিভাজন মেনে নিয়েও শেষমেষ ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকে তেলেঙ্গানা রাজ্যের দাবি মেনে নেয়।

বিগত কয়েক দশক জুড়ে, বিশেষ করে বিগত শতকের ’৯০-এর দশকে মনমোহন, চিদাম্বরম, মন্টেক সিং-দের সামনে রেখে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ নির্দেশিত নয়া-আর্থিক নীতি চালু হওয়াতে বিভিন্ন রাজ্যের অভ্যন্তরে বসবাসকারী অন্ত্যেবাসী জনগোষ্ঠী ও ক্ষুদ্র জাতিসত্ত্বাগুলোর বঞ্চনার অনুভূতি তীব্রতর হতে থাকে। দার্জিলিং পাহাড়ে গোর্খাদের পরিচিতি সত্ত্বার স্বীকৃতিটা আদায়ে আলাদা রাজ্যের দাবি শতবর্ষ পেরিয়ে ক্রমশ নতুন পর্যায়ে গণআন্দোলনে শিকড় স্পর্শ করে ২০০৭ সাল থেকে। তেলেঙ্গানা রাজ্য ঘোষণার সঙ্গে আসামের কার্বি, ডিমাসা, বোড়ো, বরাক উপত্যকা—উত্তরপ্রদেশকে বুন্দেলখণ্ড সহ আরও ৩টি ছোট রাজ্যে বিভাজন—মহারাষ্ট্রের বিদর্ভ অঞ্চলে আলাদা রাজ্যের দাবিগুলো সঙ্গত কারণে চাগিয়ে উঠেছে। কংগ্রেস তেলেঙ্গানা রাজ্য মেনে নিতে বাধ্য হলেও অন্যান্য ছোট রাজ্যের দাবিগুলোকে ঘোষণার অঙ্গ হিসাবে একলপ্তে নাকচ করে দিয়েছে।

ফলত, বিশেষ করে নিপীড়িত, বঞ্চিত জাতিসত্ত্বাগুলোর আবেগদীপ্ত প্রতিবাদ ফেটে পড়েছে কংগ্রেস ও কংগ্রেস পরিচালিত ইউ পি এ সরকারের একপেশে সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে।

১৯৮৮ থেকে দার্জিলিং পাহাড়ে জি এন এল এফ-এর সুপ্রীমো সুভাষ ঘিসিং-এর ২০ বছর ধরে চলা অপশাসনের বিরুদ্ধে পাহাড়ি মানুষের পুঞ্জীভূত ক্ষোভকে পুঁজি করে একদা ঘিসিং অনুগত বিমল গুরুং-এর নেতৃত্বে আসরে অবতীর্ণ হয় গোর্খা জনমুক্তি মোর্চা নামক দলটি—২০০৭ সালের নভেম্বরে। নতুন করে গোর্খাল্যাণ্ডের দাবিতে গড়ে ওঠা আন্দোলনে সাড়া দিল বিপুল সংখ্যক গোর্খা জনগণ। আন্দোলন শুরু হওয়ার কিছু পরেই বাতিল হয়ে গেল ঘিসিং-এর স্বশাসিত তফসিলে অন্তর্ভুক্তির প্রস্তাব। অনেক অবরোধ, বন্‌ধ, বয়কট, রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের রাজনীতির পর জনমুক্তি মোর্চার সঙ্গে কেন্দ্র-রাজ্য ত্রিপাক্ষিক জিটিএ চুক্তি সম্পাদিত হল ২০১১ সালের ১৮ জুলাই। ইতিমধ্যে বিগত বিধানসভা নির্বাচনে পাহাড়ে তিনটি আসনে জয়লাভ করে জনমুক্তি মোর্চা পাহাড়ের শাসক দলে পর্যবসিত। জি টি এ নির্বাচনের মধ্য দিয়ে নিরঙ্কুশ ক্ষমতা নিয়ে চেয়ারম্যানের স্থলাভিষিক্ত হলেন বিমল গুরুং—২০১২ সালের ৪ আগস্ট।

বিগত জমানার ডি জি এইচ সি (দার্জিলিং গোর্খা হিল কাউন্সিল)-র ৩৫টি স্বশাসিত বিভাগের পরিবর্তে ৫৯টি বিভাগের স্বশাসন, ঘিসিং পর্যদের ২৪ কোটি টাকা ব্যায়বরাদ্দের তুলনায় প্রতি বছরে ২০০ কোটি টাকা করে ৩ বছরের ৬০০ কোটি টাকার উন্নয়ন বরাদ্দের প্রতিশ্রুতি; সেই সঙ্গে ‘উন্নয়ন’-এর তকমার আড়ালে সেজ তৈরীর ছাড়পত্র ইত্যাদি সবকিছুই লিপিবদ্ধ ছিল এই চুক্তিপত্রে। কিন্তু বিগত ১ বছর সময়কালে কেন্দ্রীয়-রাজ্য সরকার আঁচায়নি তেমনভাবে। ফলত নবপর্যায়ে ৪ বছর গণআন্দোলনের জোয়ারে অংশগ্রহণকারী পাহাড়ী মানুষের জনমুক্তি মোর্চার প্রতি আস্থায় খানিকটা ভাঁটা পড়তে দেখা যায়। মোর্চার পক্ষে জি টি এ চুক্তি স্বাক্ষর করার মধ্য দিয়ে গোর্খা জাতিসত্ত্বার স্বাধিকারের চূড়ান্ত প্রাপ্তি স্বতন্ত্র রাজ্য গঠন ও গোর্খা পরিচিতিসত্ত্বার স্বীকৃতি প্রশ্নটির প্রতি বিশ্বাসঘাতকতার অভিযোগ তোলে মোর্চা বিরোধী সি পি আর এম, গোর্খা লীগ বা ভারতীয় গোর্খা পরিসংঘের নেতৃবৃন্দ। এমনকি মোর্চার নেতৃত্বের ব্যর্থতার সুযোগ নিয়ে পাহাড়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ষষ্ঠ তফসিলের যথার্থতার বিষয়টিকে সামনে নিয়ে জি এন এল এফ নতুন করে জনসমর্থন আদায়ে সক্রিয় হয়।

এমতাবস্থায় তেলেঙ্গানা রাজ্যের স্বীকৃতি গোর্খাল্যাণ্ড রাজ্য গঠনের দাবিটিকে পুনরায় যৌক্তিক করে তুলে মোর্চা সুপ্রীমো বিমল গুরুং জি টি এ-র চেয়ারম্যান পদ থেকে চটপট পদত্যাগ করে আলাদা রাজ্যের দাবিটিকে পুনরুজ্জীবিত করে বিক্ষোভ কর্মসূচী সাজিয়ে ফেলেন। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীর উপর্যুপরি পাহাড় ভ্রমণ, জি টি এ চুক্তি সম্পাদনের সময় সহাস্য উপস্থিতি এবং মোর্চার সঙ্গে মধুচন্দ্রিমা চলতি বছরের জানুয়ারি মাসে রাজ্য সরকার আয়োজিত উত্তরবঙ্গ উৎসবের দার্জিলিং পর্ব উদ্‌যাপনের সময় দিদিমনির ‘দার্জিলিং পশ্চিমবঙ্গের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ’ এই জাত্যাভিমানী ঘোষণার মধ্য দিয়ে প্রবল হুমকি ও পাল্টা হুমকির পরিবেশে ধাক্কা খায়।

এই মুহূর্তে গোর্খাল্যাণ্ডের দাবিতে মোর্চার নেতৃত্বে চলমান আন্দোলন এবং এই আন্দোলন কড়া হাতে দমন করতে মুখ্যমন্ত্রীর ‘রাফ এ্যাণ্ড টাফ’ রণহুঙ্কার পাহাড়ের বহু বিজ্ঞাপিত ‘হাসি’ ঘুচিয়ে দিয়েছে। তেলেঙ্গানা আন্দোলনের আদলে এই প্রথম দার্জিলিং পাহাড়ের গায়ে আগুন লাগিয়ে আত্মাহুতি দিয়েছেন মোর্চা সমর্থক মঙ্গল সিং রাজপুত। বিমল গুরুং-এর পদত্যাগপত্র গ্রহণ এবং তাঁর দেহরক্ষী তুলে নিয়ে মোর্চা

তিনের পাতায় দেখুন

আসামে কার্বি আংলঙ ও ডিমা হাসাও পার্বত্য ভূখণ্ডকে স্বশাসিত রাজ্য করার দাবিতে আন্দোলনের কারণে রাষ্ট্রশক্তির সশস্ত্র বাহিনীর দ্বারা ধৃত সি পি আই (এম এল) নেতা-কর্মীদের মুক্তির দাবিতে শিলিগুড়ি শহরে বিক্ষোভ মিছিল

কার্বি আংলঙে ধৃত পার্টি নেতাদের মুক্তির দাবিতে

কলকাতায় আসাম ভবনে ডেপুটেশন

তেলেঙ্গানা পৃথক রাজ্যের স্বীকৃতি পেয়ে গেল, কিন্তু কার্বি আংলঙ এখনও স্বশাসন পেল না। অসমের দুটি জেলা কার্বি আংলঙ ও ডিমা হাসাও জেলা দুটির ভিত্তিতে এই স্বশাসনের দাবি দীর্ঘদিনের। এই দাবিতে অসমের পার্বত্য দুটি জেলার জনজাতির সংগ্রামও চলে আসছে দুই দশকের বেশী সময়কাল ধরে। কেন্দ্রীয় সরকার তেলেঙ্গানাকে পৃথক রাজ্যের স্বীকৃতি দেওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে কার্বি স্বশাসনের দাবিটি পুনরায় সামনে এসেছে, জনজাতির মানুষেরা সেখানে নতুন করে সংগ্রামে নেমেছেন। কি কেন্দ্রের ইউ পি এ-র মনমোহন সরকার, কি অসমে কংগ্রেসের তরুণ গগৈ সরকার কার্বি জনতার দাবির প্রতি মান্যতা প্রদর্শনের পরিবর্তে তাদের আন্দোলনের বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা করেছে। সেখানে রাষ্ট্রশক্তির দমনে রক্তাক্ত হচ্ছে আন্দোলিত জনতা। তারই অঙ্গ হিসেবে সেখানে সি পি আই (এম এল) লিবারেশনের নেতা-কর্মীদের গ্রেপ্তার করে বন্দী করে রাখা হয়েছে।

এসবের প্রতিবাদে এবং বন্দী সাথীদের মুক্তির দাবিতে গত ৫ আগস্ট কলকাতায় অসম ভবনে সি পি আই (এম এল) লিবারেশনের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য নেতৃত্বের পক্ষ থেকে এক প্রতিনিধি ডেপুটেশন দেওয়া হয়েছে। মোট চারজনের এই প্রতিনিধি ডেপুটেশন প্রদানকারি দল কল্যাণ গোস্বামীর স্বাক্ষর সম্বলিত স্মারকলিপি দেন ভবনের ভারপ্রাপ্ত এক কমিশনারের কাছে। অসম রাজ্যের রাজ্যপালের উদ্দেশ্যে দেওয়া ঐ স্মারকলিপিতে বলা হয়—

“অসমের কার্বি আংলঙ ও ডিমা হাসাও জেলাদ্বয়কে স্বশাসিত রাজ্যের মর্যাদা দেওয়ার দীর্ঘদিনের জনগণের দাবিটি ফের পুনরুজ্জীবিত হয়েছে। এখানে এই বিষয়টির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা যেতে পারে যে, এ সংক্রান্ত একটি স্মারকলিপি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সুশীল কুমার সিন্ধে ও অসমের রাজ্যপালকেও দেওয়া হয়েছিল সি পি আই (এম এল) পার্বত্য পার্টি কমিটির তরফে, তাতে দাবি করা হয়েছিল সংবিধানের ২৪৪(ক) ধারা অবিলম্বে রূপায়িত করে কার্বি আংলঙ ও ডিমা হাসাও জেলা দুটি সহযোগে স্বশাসিত রাজ্য গঠন করতে হবে।

কিন্তু কর্তৃপক্ষ জনগণের ন্যায়সঙ্গত দাবি শোনার পরিবর্তে, সমস্ত প্রতিবাদীদের কঠোর হাতে দমন করছে। পুলিশের গুলিতে এক যুব ছাত্রের প্রাণহানি ঘটেছে। পুলিশ ব্যাপক সংখ্যায় প্রতিবাদীদের গ্রেপ্তার করেছে, তার মধ্যে রয়েছেন সি পি আই (এম এল) লিবারেশনের পার্বত্য পার্টি কমিটির সম্পাদক ও কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য রবি ফাঙচো এবং আমাদের ছাত্র সংগঠন অল ইণ্ডিয়া স্টুডেন্টস অ্যাসোসিয়েশনের নেতা লিয়াচোঙ ইঙ্গলে।

২ আগস্ট পুলিশ সেখানে সি পি আই (এম এল) অফিসে হানা দিয়ে যে সমস্ত পার্টি সদস্যরা ছিলেন তাদের গ্রেপ্তার করে নিয়ে গেছে।

রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষের এই আচরণকে আমরা তীব্র ধিক্কার জানাই এবং আমাদের পার্টি নেতা ও সদস্য সহ সমস্ত ধৃত প্রতিবাদীদের অবিলম্বে নিঃশর্তে মুক্তি দেওয়ার দাবি করছি। একই সাথে দাবি করছি সংবিধানের ২৪৪(ক) ধারা অবিলম্বে রূপায়ণ করে পার্বত্য জেলাদ্বয় কার্বি আংলঙ ও ডিমা হাসাওকে স্বশাসিত রাজ্য করতে হবে।”

সম্পাদকীয়

চলছে চণ্ডনীতি

সংবাদ জগতে আবার হঠাৎ 'মাওবাদী' ধরার নাম তুলল মমতা সরকার। কলকাতা পুলিশের এক গোয়েন্দা শাখা স্পেশ্যাল টাস্ক ফোর্স, সংক্ষেপে এস টি এফ আবার এরকম একটা গ্রেপ্তারী দেখিয়েই ছাড়ল। গ্রেপ্তার করা হল যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের এক প্রাক্তন ছাত্রীকে। তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে কোথা থেকে তা নিয়ে খবরের বিতর্ক রয়েছে। পুলিশের দাবি তাঁকে বাড়ি থেকে ধরা হয়েছে, বেসরকারি সূত্রের মতে, তাঁকে ধরা হয়েছে দক্ষিণ কলকাতায় মুখ্যমন্ত্রীর বাড়ির এক কিলোমিটার দূরের রাস্তা থেকে। যাঁকে 'মাওবাদী' বলে ধরা হল তিনি বহুজনের কাছে পরিচিত 'মাতঙ্গিনী মহিলা সমিতি'র নেত্রী হিসাবে। নেপথ্যে তিনি যদি 'মাওবাদী' দলভুক্ত হয়েও থাকেন তাহলেই বা তাঁকে গ্রেপ্তার করা হবে কেন? কোন্ 'যুক্তি'তে? পুলিশ 'যুক্তি' দিচ্ছে কিছু 'প্রমাণপত্র' পাওয়া গেছে। চালাচালি হওয়া কিছু চিঠির প্রমাণ পুলিশের হাতে এসেছে। কীসের চিঠি! না, তিনি বছরখানেক আগে দীর্ঘ বন্দীজীবন থেকে মুক্তি পাওয়া এক প্রবীণ 'মাওবাদী'-র সাথে যোগাযোগ রাখতেন। তাছাড়া তিনি দলের হয়ে কলকাতা ও পার্শ্ববর্তী শহরাঞ্চলে বিভিন্ন গণসংগঠনের মধ্যে সমন্বয় ও জঙ্গলমহলের সাথে সম্পর্ক পুনরুজ্জীবনকরণের বিশেষ দায়িত্বে ছিলেন। পুলিশী ভাষ্যকে যদি তর্কের খাতিরে 'যুক্তি' হিসেবে ধরাও হয় তাহলে এর মধ্যে গ্রেপ্তার করার কারণ তৈরী হয় কিভাবে! পুলিশ একতরফা অযথা বিপজ্জনক সন্দেহের বাতাবরণ তৈরী করে জবরদস্তি গ্রেপ্তার করল। কে কোন্ সংগঠন করবেন বা কার সাথে যোগাযোগ রাখবেন সেটা তাঁর গণতান্ত্রিক পছন্দের অধিকার। রাজ্য সরকারের গোয়েন্দা পুলিশই বরং যেভাবে হেফাজতবন্দী করল সেটাই ক্রিমিনাল অফেন্সে অভিযুক্ত করার। নোনাডাঙ্গার উচ্ছেদ বিরোধী আন্দোলন থেকে কামদুনির ধর্ষণকারিদের শাস্তির দাবিতে আন্দোলন—এরকম যেখানেই কোন আন্দোলন, আর যে আন্দোলন গণতান্ত্রিকভাবে মমতা সরকারকে দমনতন্ত্রের অভিযোগে কাঠগড়ায় তুলছে, সেখানেই দেখা যাচ্ছে এই সরকার লাগাতার দমননীতির পন্থা নিচ্ছে, তার জন্য 'মাওবাদী' তকমা দেওয়া থেকে শুরু করে তথাকথিত 'মাওবাদী' ধরপাকড় অভিযান চালাচ্ছে।

উপরোক্ত কেসের ক্ষেত্রে রাজ্য সরকারের গোয়েন্দা পুলিশ যে কারামুক্ত 'মাওবাদী' নেতার সাথে যোগাযোগ থাকার প্রমাণ পাওয়ার দাবি করেছে তিনি তা সম্পূর্ণতই অস্বীকার করেছেন। পুলিশ দাবি করছে ঐ ব্যক্তি 'মাওবাদী'দের পলিটব্যুরো সদস্য ছিলেন এবং নতুন করে সংগঠনকে আবার গোপনে থেকে চাঙ্গা করে তোলার কার্যকলাপ চালিয়ে যাচ্ছেন! অন্যদিকে যিনি পুলিশী অভিযুক্তের তালিকায়, তিনি দাবি করেছেন একদা মাওবাদী সংগঠনের (পলিটব্যুরো সদস্য নন) রাজ্য কমিটির সদস্য ছিলেন, আর জেল থেকে বের হওয়ার পর ঐ দলের সাথে আর যুক্ত নন, মানবাধিকার সংগঠনের কাজ আর পরিবারের ভরণপোষণের জন্য দেশের বাড়িতে চাষবাসের কাজে যুক্ত, এবং তিনি কোথাও পালিয়ে যাননি, যদিও চাষবাস এবং বিভিন্ন জেলায় মামলা-মোকদ্দমার জন্য আদালতে হাজিরা দিতে তাঁকে যাতায়াত করতে হয়। পুলিশের দাবি, সন্দেহের তালিকাভুক্ত মহাশয়টির সম্প্রতি মেয়ের বিয়েতে 'মাওবাদী' নেতারা এসেছিলেন। আর পুলিশী প্রচারে আক্রান্ত মানবাধিকার কর্মী মহাশয়ের বক্তব্য হল, আত্মীয়স্বজন-বন্ধুবান্ধবরা এসেছিলেন। পুলিশ এখন কাউকে শিকারের চাঁদমারীর মধ্যে রাখতে এমনকি পারিবারিক ক্রিয়াকর্মের ওপরও গোপন নজরদারি চালাচ্ছে, তার বৈধতা দাবি করছে। এক সার্বিক চণ্ডনীতি চলছে। হয় তৃণমূলী হও, তৃণমূলের জয়ধ্বনী দাও, নয়তো 'সি পি এম'-'মাওবাদী' যেখানে যেমন সুবিধে ছাপ্পা মেরে দিয়ে লাশ বানিয়ে দেওয়া হবে, হাজতে ঢুকিয়ে দেওয়া হবে। এটাই মমতা সরকারের চণ্ডনীতির সার লক্ষ্য-উদ্দেশ্য। সুর-স্বর সবই তিনিই বেঁধে দিচ্ছেন। চলছে একদলীয় শাসনের চরম স্বেচ্ছাচারতন্ত্র।

পাহাড়ে রাষ্ট্রীয় দমনপীড়ন বন্ধ কর গোর্খা আন্দোলনের সংগঠনগুলোর সাথে আলোচনার ব্যবস্থা কর

গত ৬ আগস্ট এক প্রেস বিবৃতিতে সি পি আই (এম এল) পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্পাদক পার্থ ঘোষ বলেন—

রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বিগত কয়েক মাস ধরে পাহাড় হাসছে বলে প্রচার করে গেলেন। আজ সেই পাহাড় উত্তপ্ত ও হিংসার কবলে। অত্যন্ত অগণতান্ত্রিকভাবে গোর্খা জনজাতির আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত অন্যান্য সমস্ত সংগঠনকে বাদ দিয়ে রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকার এবং গোর্খা জনমুক্তি মোর্চার মধ্যে যে দ্বিপাক্ষিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হল এবং যার ভিত্তিতে জি টি এ গঠন করা হল তা গোর্খা জনজাতি ও পাহাড়ের মানুষের কোনও ন্যায়সঙ্গত দাবিরই সমাধান করতে পারেনি। জি টি এ-কে অস্বীকার করে মুখ্যমন্ত্রী গোর্খা পার্বত্য পরিষদ অঞ্চলে পাট্টা বিলি করলেন। লেপচাদের জন্য উন্নয়ন পর্ষদের একতরফা ঘোষণা করে দিলেন। যা স্বাভাবিকভাবেই জি টি এ-র কার্যকারিতা নিয়ে প্রশ্ন তুলে দিল। ''রাফ এ্যাণ্ড টাফ'' শ্লোগান দিয়ে গোর্খা জনজাতিকে বুঝিয়ে দেওয়া হল বর্তমান মুখ্যমন্ত্রীও পূর্বতন শাসকদের মতোই রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের পথকেই বেছে নিতে চান। কেন্দ্রের কংগ্রেস সরকার তেলেঙ্গানা রাজ্য গঠনের পথে অগ্রসর হওয়ার সাথে সাথে দেশজুড়ে জাতিসত্তার আন্দোলন জোরদার হয়েছে। এই আন্দোলনকে সি আর পি দিয়ে রাষ্ট্রীয় দমনপীড়ন চালিয়ে দমিয়ে রাখার চেষ্টা আত্মঘাতী হতে বাধ্য। গোর্খাল্যাণ্ড গঠনের দাবি সহ জনগণের ন্যায়সঙ্গত দাবিগুলোর সুষ্ঠু মীমাংসার জন্য কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারকে অবিলম্বে পাহাড়ের সমস্ত গণতান্ত্রিক সংগঠনের সঙ্গে আলোচনায় বসতে হবে। উগ্র বাঙালি জাতীয়তাবাদে উস্কানি দিয়ে পাহাড়ের পরিবেশকে আরও হিংসার দিকে ঠেলে দেওয়ার যে কোনও অপচেষ্টার বিরুদ্ধে রাজ্যবাসীকে সতর্ক থাকতে হবে। গোর্খা জনমুক্তি মোর্চাকেও হিংসার পথ ত্যাগ করে আলাপ-আলোচনার পরিবেশ ফিরিয়ে আনতে হবে। পাহাড় ও সমতলে আমাদের পার্টি বিভিন্ন জাতিসত্তার মধ্যে বন্ধুত্ব ও সুসম্পর্কের পরিবেশ সৃষ্টির জন্য লাগাতার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাবে।

''আজকের দেশব্রতী'' সম্পাদকমণ্ডলী
অনিমেষ চক্রবর্তী, সুকান্ত মণ্ডল, অতনু চক্রবর্তী,
জয়দীপ মিত্র, অমিত দাশগুপ্ত,
সৌভিক ঘোষাল ও কল্যাণ গোস্বামী

ইউ পি এ সরকার ঃ আমেরিকান প্রভুদের তোয়াজ করা বন্ধ কর

সংসদের বাদল অধিবেশন আগস্ট মাসে শুরু হবে এবং সরকারের বক্তব্য হল যে, তারা আগামী সাধারণ নির্বাচনের আগে অনুষ্ঠিত এই শেষ গুরুত্বপূর্ণ অধিবেশনে গুরুত্বপূর্ণ কিছু আইন গ্রহণ করতে আলোচনা চায়। সংসদের দুই কক্ষে খাদ্য নিরাপত্তা বিল সহ ৯৯টা বিল আলোচনার জন্য অপেক্ষা করছে, অবশ্য খাদ্য নিরাপত্তা বিল অর্ডিন্যান্সের মাধ্যমে ইতিমধ্যেই লাগু হয়ে গেছে। সংসদের অধিবেশন যখন সামনেই অনুষ্ঠিত হবে, তখন স্বাভাবিকভাবেই অর্ডিন্যান্স জারী করে সংসদীয় প্রক্রিয়াকে এড়িয়ে না গিয়ে প্রথমেই এই বিলটি সংসদের মধ্যে আলোচনা করা দরকার ছিল। কিন্তু ইউ পি এ সরকার জনগণের অনাহার জনিত ধারাবাহিক সমস্যাকে নির্বাচনী পুঁজি করতে অর্ডিন্যান্স জারীর আশ্রয় নিল।

চরম কলঙ্কিত ও মরিয়া ইউ পি এ সরকারের আসল উদ্দেশ্য অবশ্য খাদ্য নিরাপত্তা আইনের নামে প্রতারণা করার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, তারা আমেরিকান প্রভুদের সন্তুষ্ট করতেও দিবারাত্র চেষ্টা করে যাচ্ছে। তারা আশা করছে যে আমেরিকার দেওয়া 'দক্ষতা ও সুশাসনের' সার্টিফিকেট নিয়ে তারা ভারতের বিক্ষুব্ধ ভোটারদের প্রভাবিত করতে পারবে। টাকার দাম মারাত্মকভাবে কমে ডলার প্রতি ৬০ টাকায় দাঁড়ানোয় আমদানি বিলকে সামাল দেওয়া অসম্ভব হয়ে পড়ছে। স্বল্পমেয়াদী ঋণ পরিশোধের বাধ্যবাধকতা ভারতের বৈদেশিক মুদ্রা সঞ্চয়ের ওপর চাপ সৃষ্টি করছে। ১৯৯০ দশকের গোড়াতে একইরকম পরিস্থিতি দেখা দিয়েছিল যখন ভারতের নীতি নির্ধারকেরা উদারীকরণ, বেসরকারীকরণ ও বিশ্বায়নের নয়া উদারনৈতিক নীতি গ্রহণ করে। এখন ২২ বছর পর ভারতের অর্থনীতি যখন গভীরতর সংকটের মধ্যে পড়েছে তখনও ভারতের নীতি নির্ধারকেরা বিশ্ব পুঁজির প্রতি আরও ছাড় দেওয়া ছাড়া অন্য কিছু ভাবতে পারে না।

সাধারণ নির্বাচন যত এগিয়ে আসছে এবং অর্থনৈতিক সংকটের কালো ছায়া আরও গভীর ও বিস্তৃত হচ্ছে, ভারতের নীতি নির্ধারণকারী সংস্থার মূল স্থপতিদের সঙ্গে তাদের আমেরিকান সঙ্গীদের গভীর শলা পরামর্শও শুরু হয়ে গেছে। যেমন চিদাম্বরম, আনন্দ শর্মা ও মন্টেক সিং আলুওয়ালিয়া তাদের আমেরিকা সফর (প্রভুদের তোয়াজ করার উদ্দেশ্যে)-এর পরপরই টেলিকম, বীমা ও প্রতিরক্ষা সহ এক ডজন রণনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ সেক্টরে প্রত্যক্ষ বিদেশী বিনিয়োগের সীমাকে বৃদ্ধি করার ঘোষণা হল। এই ঘোষণা আরও বেশি পাওয়ার জন্য আমেরিকার ক্ষুধাকে বাড়িয়েই দিয়েছে এবং আমেরিকার উপ-রাষ্ট্রপতি জো বিডেন তাঁর ভারত সফরের সময় তাঁদের আঙ্কাকার যে তালিকা পেশ করেছেন তাতে এটা খুবই স্পষ্ট। বিডেন-র সফরের পর আমেরিকার স্বরাষ্ট্র সচিব জন কেরী ভারত সফর করলেন এবং এর পরেই বছরের শেষে ওয়াশিংটনে হবে মনমোহন-ওবামা-র আর একটা বৈঠক।

কংগ্রেস তার প্রথম দফাতে আমেরিকা-ভারত রণনৈতিক অংশীদারিত্ব চুক্তি এবং তারপরে পরমাণু চুক্তি স্বাক্ষর করে। পরবর্তী লোকসভা নির্বাচনের আগেই কংগ্রেস এখন দেশকে আমেরিকার পাতা পলিসি ফাঁদের আরও গভীরে ফেলতে চাইছে। বিডেন-এর পেশ করা আকাঙ্খা তালিকা থেকে বোঝা যায় যে আমেরিকা কি ধরণের কনসেশন দাবি করছে এবং কংগ্রেসও শেষ পর্যন্ত তা দেবে। আমেরিকা কেবলমাত্র সমস্ত সেক্টরে আরও বেশী প্রত্যক্ষ বিদেশী বিনিয়োগই চাইছে না, বরং আমেরিকা থেকে আমদানি করা পণ্যের ওপর ভারতের আরও বেশী নির্ভরশীলতা এবং ভারতের ট্যাক্স ব্যবস্থাকে তাদের জন্য সুবিধাজনক ও আরামপ্রদ চাইছে। বিশেষ করে আমেরিকা চাইছে যে ভারতের বীমা ক্ষেত্রকে পুরোপুরি উন্মুক্ত করা হোক, মেধাস্বত্বের অধিকারের জন্য আমেরিকার ওষুধ কোম্পানীগুলোর দাবি মেনে নেওয়া হোক এবং অসামরিক ক্ষেত্রের জন্য পারমাণবিক বাণিজ্য আইনে দায়বদ্ধতার ধারাকে, পুরোপুরি তুলে দেওয়া না হলেও, নরম করা হোক। ভারত-আমেরিকা বিজনেস কাউন্সিলও ভারতে জমি অধিগ্রহণের ক্ষেত্রে সেকেলে আইন সম্পর্কে অভিযোগ করে বারাক ওবামাকে চিঠি পাঠিয়েছে।

অর্থনৈতিক স্বার্থ ছাড়াও আমেরিকা তার নিজের আফগানিস্তান-পাকিস্তান নীতিকে রূপায়ণ করতে ভারতের নিশ্চিত সহযোগিতা চাইছে। আমেরিকা ও তার সহযোগী ন্যাটো যেহেতু ২০১৪ সালের মধ্যে আফাগানিস্তান থেকে তাদের বাহিনী সরিয়ে আনতে মনস্থ করেছে, তাই আমেরিকা চাইছে যে ভারত এগিয়ে এসে এই শূন্যস্থান পূরণ করুক। আমেরিকার পরিকল্পনা মেনে নিয়ে আফগানিস্তানের বিষয়ে ভারতের জড়িয়ে পড়াটা ভারতের পক্ষে বিপদজনক হবে। এর ফলে তালিবান প্রতিরোধ ও সন্ত্রাসবাদী হামলার লক্ষ্যবস্তু হয়ে দাঁড়াবে ভারত। এটা অবশ্যম্ভাবীরূপে পাকিস্তানের সঙ্গে সংঘাতের সম্ভাবনা ও উত্তেজনা সৃষ্টির দরজা খুলে দেবে। দ্বিপাক্ষিক ও দক্ষিণ এশিয় সহযোগিতার কাঠামোর মধ্যে আফগানিস্তানের প্রতি ভারতের সহযোগিতা প্রদান এক জিনিস, কিন্তু আফগানিস্তান সম্পর্কে আমেরিকার অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামরিক পরিকল্পনায় সামিল হওয়াটা সম্পূর্ণ আলাদা ব্যাপার।

গত দু'দশক ধরে একের পর এক সরকারের দ্বারা কর্পোরেটমুখী ও মার্কিনমুখী নীতি নিয়ে চলার ফলে ভারত ইতিমধ্যেই গভীর অর্থনৈতিক ও বৈদেশিক নীতির সংকটে পড়েছে। নির্বাচনের প্রাক্কালে ইউ পি এ সরকারের দ্বারা উন্মত্তের মতো এই ধরনের পদক্ষেপ নেওয়াটা কেবলমাত্র সংকটকেই আরও বাড়িয়ে তুলবে। সমগ্র দেশকে অবশ্যই এই বিপর্যয় সৃষ্টিকারী পদক্ষেপকে সর্বশক্তি দিয়ে প্রতিরোধ করতে হবে এবং তার সমগ্র নীতিসমূহ সহ কলঙ্কিত ইউ পি এ সরকারকে পরাজিত করতে প্রস্তুত হতে হবে।

(এম এল আপডেট সম্পাদকীয়, ৩০ জুলাই ২০১৩)

গদর দি গুঞ্জ্
গদর আন্দোলনের শতবর্ষ উদ্‌যাপনে
সারা ভারত বাম সমন্বয় (এ আই এল সি) আয়োজিত
কনভেনশন
নয়া দিল্লী ।। ১১ আগস্ট
মবলঙ্কার অডিটোরিয়াম (কনস্টিটিউশন ক্লাব, রফি মার্গ)

তেলেঙ্গানার আত্মপ্রকাশ ও তার প্রতিক্রিয়া

নতুন এক রাজ্য পুনর্গঠন কমিশনের দাবিকে সামনে নিয়ে এসেছে

ভারতের উনত্রিশতম রাজ্য হিসেবে আত্মপ্রকাশ করতে চলেছে তেলেঙ্গানা। দীর্ঘদিনের আন্দোলন ও রাজনৈতিক টালবাহানার পর্ব পেরিয়ে সংযুক্ত অন্ধ্রপ্রদেশের অংশ নিয়ে এই আত্মপ্রকাশের রাজনৈতিক প্রশাসনিক সিদ্ধান্তের কথা সামনে আসার পর থেকে দেশজুড়ে শুরু হয়েছে আলোড়ন। গোটা ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে বেশ কয়েক দশক ধরে সক্রিয় পৃথক রাজ্যের দাবিগুলো নিয়ে আলোচনা ও আন্দোলন নতুন করে সামনে এসেছে। এর মধ্যে সামনের সারিতে রয়েছে অধুনা আসামের অংশ নিয়ে একদিকে বড়োল্যাণ্ড ও অন্যদিকে কার্বি আংলঙ, পশ্চিমবঙ্গের দার্জিলিং ও সংলগ্ন অঞ্চল নিয়ে গোর্খাল্যাণ্ড, মহারাষ্ট্রের অংশ নিয়ে বিদর্ভ, উত্তরপ্রদেশের অংশ নিয়ে বুন্দেলখণ্ড গঠনের প্রসঙ্গ। কেন্দ্র ও সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকারসমূহ তথা বিভিন্ন রাজনৈতিক দল এ প্রসঙ্গে রকমারী অবস্থান নেওয়াও শুরু করেছেন। সব মিলিয়ে তেলেঙ্গানা ও সেই সূত্রে নতুন রাজ্যের দাবি ভারতীয় রাজনীতির আবহে এই মুহূর্তে অন্যতম আলোচনার বিষয় হয়ে উঠেছে। লোকসভা নির্বাচন সামনে থাকায় ভোট ও জোট রাজনীতির জটিল নানা অঙ্কও এই পরিপ্রেক্ষিতে সজীব হয়ে উঠেছে। অনুমান করা যায় পরবর্তী কেন্দ্রীয় সরকার গঠনের সমীকরণ নির্ণয়ে পৃথক রাজ্যের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষে ভালোরকম ভূমিকা পালন করবে। সে প্রসঙ্গে যাওয়ার আগে তেলেঙ্গানা রাজ্য গঠনের প্রেক্ষাপটটি লক্ষ্য করা যাক।

স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে বরাবরই তার নিজস্ব ভূমিখণ্ডের ওপর প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণের উতরোল থাকা তেলেঙ্গানার অতীতের দিকে ফিরলে আমরা লক্ষ্য করব মৌর্য পরবর্তী সময় থেকেই এই অঞ্চলের নিজস্ব অস্তিত্ব ও সংস্কৃতির ইতিহাস রয়েছে। খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় শতক থেকে খ্রীষ্টীয় তৃতীয় শতক পর্যন্ত সাতবাহনরা এই অঞ্চলে তাদের শাসন কায়েম করেছিল। একাদশ শতাব্দীর শেষ থেকে চতুর্দশ শতাব্দীর প্রথম দিক অবধি কাকাতিয় শাসনের সময়কাল ছিল এই অঞ্চলের অন্যতম গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়। চতুর্দশ শতকে এই এলাকা দিল্লী সুলতানীর শাসনাধীনে আসে। তারপর বাহমনী এবং কুতুব শাহী শাসকরা এখানে তাদের শাসন কায়েম করেন। একবছর প্রতিরোধের পর গোলকুণ্ডা দুর্গ ও এই অঞ্চল ১৬৮৭ সালে ঔরঙ্গজেব অধিকার করে নেন ও তা মুঘল শাসনাধীনে আসে। ঔরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর কেন্দ্রীয় মুঘল শাসন দুর্বল হয়ে পড়ার সুযোগে নিজাম-এর স্বাধীন নিয়ন্ত্রণভুক্ত হয়ে এখানকার শাসন চলতে থাকে। নিজাম ১৭৯৯ সালে ব্রিটিশদের সাথে অধীনতামূলক মিত্রতা নীতিতে আবদ্ধ হন। প্রসঙ্গত উল্লেখ, এই পর্বে রাজধানীর নাম অনুসারে নিজাম শাসিত গোটা এলাকা হায়দ্রাবাদ নামে পরিচিত ছিল।

ভারতের স্বাধীনতার পর থেকে নিজাম শাসিত এই অঞ্চল নিয়ে রাজনীতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। স্বাধীনতার পর নিজাম ভারত পাকিস্তান কোথাও অন্তর্ভুক্ত হতে চাননি। অপারেশন পোলো অভিযানের মধ্য দিয়ে ১৯৪৮ সালের ১৭ সেপ্টেম্বর ভারত সরকার হায়দ্রাবাদের দখল নেয়। এইসময়ে নিজাম রাজ্যের সামন্তী শাসনের বিরুদ্ধে কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে তেলেঙ্গানা জুড়ে চলছিল উত্তুঙ্গ কৃষক আন্দোলন। ভারতীয় সেনা নির্মম আগ্রাসন চালিয়ে সে আন্দোলনও দমন করে। ভারতের স্বাধীনতার সময়ে তেলেগুভাষী জনগণের অধিকাংশ যে ২২টি জেলায় বাস করতেন তার মধ্যে ৯টি ছিল নিজাম শাসিত হায়দ্রাবাদ, ১২টি ছিল মাদ্রাজ প্রদেশে আর ১টি ছিল ফরাসী নিয়ন্ত্রণাধীন ইয়ানাম। উত্তর সিরকাস ও রায়লসীমা অঞ্চলের তেলেগুভাষী অঞ্চলগুলো নিয়ে ১৯৫৩ সালে গঠিত হয় অন্ধ্রপ্রদেশ রাজ্য, এর রাজধানী হয় কুরনুল। এই ১৯৫৩ সালের ডিসেম্বর মাসেই তৈরি হয় রাজ্য পুনর্গঠন কমিশন, যার সুপারিশ পরবর্তীকালে ভারতের রাজ্য বিভাজন নীতির মূল মেরুদণ্ড হিসেবে কাজ করেছে। রাজ্য পুনর্গঠন কমিশন মূলত ভাষার ভিত্তিতে ভারতীয় রাজ্যের বিভাজন ও পুনর্বিন্যাসের নীতি গ্রহণ করে। কিন্তু এতদসত্ত্বেও কমিশন তার রিপোর্টে তেলেগুভাষী তৎকালীন দুটি পৃথক রাজ্য হায়দ্রাবাদ (বর্তমান প্রস্তাবিত তেলেঙ্গানা রাজ্যের এলাকার সঙ্গে যা মোটামুটি মেলে) ও অন্ধ্রপ্রদেশ (তেলেঙ্গানা ব্যতীত বর্তমান অন্ধ্রপ্রদেশের অংশের সঙ্গে যার এলাকাগত মিল আছে)-কে সংযুক্ত করে খুব দ্রুত একটি অখণ্ড অন্ধ্রপ্রদেশ গড়ে তোলার কথা বলেনি। রাজ্য পুনর্গঠন কমিশন প্রদত্ত রিপোর্টের ৩৮২ নং অধ্যায়টি এই সংক্রান্ত প্রশ্নে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ, যেখানে কমিশন জানায়, ‘‘অন্ধ্রে সংযুক্ত রাজ্য নির্মাণের জন্য আগ্রহ খুবই প্রবল, কিন্তু তেলেঙ্গানায় জনমত এখনও এর সপক্ষে গড়ে ওঠেনি। অন্ধ্রের গুরুত্বপূর্ণ নেতা ও জনমতের ওপর প্রভাব সঞ্চারকারীরা তেলেঙ্গানা ও অন্ধ্রের সংযুক্তির পক্ষে থেকেও এটা মনে করেন শেষ পর্যন্ত তেলেঙ্গানার মানুষের স্ব-ইচ্ছার ভিত্তিতেই এই সংযুক্তি হওয়া উচিত। প্রাথমিকভাবে তেলেঙ্গানার মানুষই ঠিক করবেন তারা কি চান।’’

তেলেঙ্গানার মানুষদের সংযুক্তি সম্পর্কে আপত্তির কিছু বাস্তবসম্মত কারণ ছিল। বেশি রাজস্বের জোগান তেলেঙ্গানা থেকে এলেও অর্থনৈতিকভাবে এটি ছিল অপেক্ষাকৃত পিছিয়ে পড়া। তেলেঙ্গানাবাসীর আশঙ্কা ছিল তাদের রাজস্বের অতিরিক্ত ভাগটা তাদের কল্যাণে ব্যয় না হয়ে অন্যত্র চলে যাবে। কৃষ্ণা ও গোদাবরী নদীর পরিকল্পিত সেচ প্রকল্পের সাহায্যও তারা কম পাবে বলে আশঙ্কা করেছিল। ব্রিটিশ শাসনাধীন সময়ে শিক্ষা ক্ষেত্রে এগিয়ে থাকায় তেলেঙ্গানার বাইরের তেলেগুভাষী মানুষেরাই প্রশাসনিক ও অন্যত্র কাজে বেশি সুযোগ পেয়ে যাবে, এমন মনোভঙ্গীও তাদের তাড়িত করেছিল। তেলেঙ্গানাবাসীদের অখণ্ড তেলেগু রাজ্যের প্রতি সন্ধিগ্ধ আপত্তির কথা বিবেচনা করে কমিশনের প্রস্তাব ছিল অন্ধ্রপ্রদেশের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার সুযোগ নিয়ে তেলেঙ্গানা আলাদা রাজ্য হিসেবে কিছুদিন থাক। পরবর্তী নির্বাচনে (১৯৬১-র নির্বাচন) তেলেঙ্গানা বিধানসভায় যদি দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে সংযুক্তির সিদ্ধান্ত হয়, তবেই তেলেঙ্গানা বাকি অন্ধ্রের সঙ্গে সংযুক্ত হবে। কিন্তু এই অভিমতের বিরুদ্ধে গিয়ে কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব তেলেঙ্গানাকে অন্ধ্রের সঙ্গে সংযুক্ত করার সিদ্ধান্ত নেন। হায়দ্রাবাদ বা তেলেঙ্গানার মুখ্যমন্ত্রী রামকৃষ্ণ রাও ব্যক্তিগত আপত্তি সত্ত্বেও কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের সিদ্ধান্ত মেনে নেন। ১৯৫৬ সালের ১ নভেম্বর অখণ্ড অন্ধ্র রাজ্য গঠিত হয়। তবে এর সম্পর্কে সেই লগ্নেই সংশয় ব্যক্ত করে প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু বলেন, এই সংযুক্তিকরণের মধ্যে সম্প্রসারণবাদ-সাম্রাজ্যবাদের ছায়া আছে। বিবাহের সঙ্গে তুলনা করে তিনি জানান, বিচ্ছিন্নতার অধিকার নিয়েই এই সংযুক্তিকরণ হচ্ছে।

বাস্তবতা, স্থানীয় আবেগ ও ইতিহাসের সূত্র ধরে রাজ্য পুনর্গঠন কমিশন যে সুপারিশ করেছিল তাকে জোর করে অগ্রাহ্য করে কেন্দ্রীয় সরকার তথা কংগ্রেস নেতৃত্ব যে অবিমৃশ্যকারিতা ও স্বৈরতান্ত্রিক ঔদ্ধত্য সেদিন প্রকাশ করেছিল, পরবর্তীকালে এই অঞ্চলের রাজনৈতিক জটিলতার মধ্য দিয়ে জনগণকে তার মাশুল দিতে হয়েছে। জনমত গঠনের আগে জোর করে সংযুক্তির ফলে তেলেঙ্গানায় বিচ্ছিন্নতার দাবি ধারাবাহিকভাবে সক্রিয় থেকেছে। প্রায়ই আন্দোলন, দমন ও পাল্টা বিক্ষোভ স্বাভাবিক জনজীবনকে ব্যাহত করেছে। দেশীয় রাজনীতির এক ভিন্ন পরিমণ্ডলে, আঞ্চলিক দলগুলোর উত্থান ও শক্তি বৃদ্ধির নতুন পরিপ্রেক্ষিতে কংগ্রেস নির্বাচনী সাফল্যের নিরীখ থেকে তেলেঙ্গানা বিভাজনের নীতি নিচ্ছে। কিন্তু পৃথক রাজ্যের দাবি শুধু তেলেঙ্গানাতেই সীমাবদ্ধ নেই। স্বাভাবিকভাবেই তেলেঙ্গানা গঠনের সিদ্ধান্তে সেসব দাবি নিয়ে আন্দোলনকারীদের বঞ্চনার বোধ ও ক্রোধ আরও তীব্র হওয়া স্বাভাবিক। এই রাজনৈতিক বাস্তবতাকে কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন ইউ পি এ এড়িয়ে যেতে বা উপেক্ষা করতে বা ভোটবাক্সের স্বার্থে ব্যবহার করে নিতে সচেষ্ট, কিন্তু কোনও দীর্ঘস্থায়ী সমাধানে আগ্রহী নয়। ২০০১ সালে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি একটি আবেদনে তৎকালীন বিজেপি শাসিত এন ডি এ সরকারকে অনুরোধ করেছিল বিভিন্ন রাজ্যের দাবির পরিপ্রেক্ষিতে একটি নতুন রাজ্য পুনর্গঠন কমিশন তৈরি করতে। ২০০৪ থেকে টানা দশবছর কেন্দ্রীয় ক্ষমতায় এরপর তারা নিজেরা থাকলেও সমস্যা সমাধানে এই কমিশন গঠনে তাদের কোনও আগ্রহ লক্ষ্য করা যায়নি। সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকার ও তাদের শাসকদলগুলোও মূলত প্রাদেশিকতার অস্মিতাকে সামনে রেখেই এই সমস্ত আন্দোলনের নিজস্ব পরিচিতির লড়াই ও যুক্তিকাঠামোকে দমন করতে উদ্যত, যা প্রকৃত গণতান্ত্রিক আবহের পক্ষে ধ্বংসাত্মক ভূমিকা গ্রহণ করছে। ভারতীয় গণতন্ত্রকে প্রসারিত ও মজবুত করার জন্য দমন ও উপেক্ষার পরিবর্তে নতুন এক রাজ্য পুনর্গঠন কমিশন তৈরি করার মধ্য দিয়ে খোলা মনে এই সমস্ত নতুন রাজ্যের দাবির পর্যালোচনা ও গণতান্ত্রিক সমাধান বিশেষ প্রয়োজনীয় হয়ে উঠেছে।

- সৌভিক ঘোষাল

তেলেঙ্গানা-গোর্খাল্যাণ্ড ...

একের পাতার পর

নেতৃত্বকে কোণঠাসা করতে চেয়েছেন মমতা। এবারে আরও ফাঁস আঁটতে বিমল, রোশনের পাসপোর্ট বাতিল, রোশন গিরি সহ ৪ জি টি এ সদস্যের নিরাপত্তা ব্যবস্থা প্রত্যাহার করে এবং মোর্চা নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে পুরানো ফৌজদারি মামলা নিয়ে তৎপরতা দেখাতে শুরু করেছে রাজ্য সরকার। আন্দোলনকারীরা নতুন করে সরকারি বাংলোয় অগ্নিসংযোগ, পুলিশ ফাঁড়ি আক্রমণ, ব্যাপক সংখ্যায় গ্রেপ্তারের বিরুদ্ধে থানা ঘেরাও, রাস্তায় নেমে অভিনব পদ্ধতিতে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ অব্যাহত রেখেছে। পাহাড়ি মানুষের বিদ্রোহ দমন করতে রাজ্য সরকারের অনুরোধে মোতায়েন হয়েছে ৫ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী। আরও ২ কোম্পানী রওনা হয়েছে দার্জিলিং-এর পথে।

বিগত জমানার শাসক বামফ্রন্টের পুরানো নেতারা তৃণমূল শাসকের এ হেন দমন-পীড়নের সাজসজ্জার বিরুদ্ধে কথা বলছে। কিন্তু ১৯৮৬-৮৮ কালপর্বে তাঁদের আমলেও ঘিসিং-এর আন্দোলন দমন করতে তাঁরাও রাজ্যের শাসক হিসাবে একই পদ্ধতি অবলম্বন করেছিলেন—একথা বিস্মৃতির গর্ভে তলিয়ে যাওয়ার নয়। সে সময়েও ১২০০ জি এন এল এফ কর্মী ও ২০০ সি পি এম কর্মীর পুলিশী আক্রমণ ও রাজনৈতিক সংঘাতে মৃত্যুর মধ্য দিয়ে শেষতক কেন্দ্র-রাজ্য সরকারকে ঘিসিং-এর সঙ্গে আলোচনা (মুচলেখা) করে আপাত সমাধানের রাস্তা খুঁজতে হয়েছিল। আজকে উত্তর-পূর্বের কার্বি আংলঙে স্বতন্ত্র রাজ্যের দাবিতে আন্দোলনকারীদের দমন করতে শাসক কংগ্রেস ইতিমধ্যে পুলিশী দমন-পীড়ন, কার্ফু, লাঠি, গুলির ব্যবহার, নির্বিচারে গ্রেপ্তার ইত্যাদি নামিয়ে আনলেও আন্দোলন ক্রমশ দুর্নিবার হয়ে উঠছে।

দার্জিলিং পাহাড়ের রাষ্ট্রীয় দমন-পীড়নের প্রেক্ষিতে মোর্চা শাসক দলের তকমা মুছে ফেলতে বাধ্য হচ্ছে। যে ফাঁকফোকর দিয়ে ঘিসিং-এর দল জি এন এল এফ কিছুটা জনসমর্থন আদায়ে সচেষ্ট হয়েছিল তাঁরাও গোর্খাল্যাণ্ডের উজ্জীবিত দাবির মুখে হতোদ্যম হয়ে পড়েছে। সি পি আর এম, গোর্খা লীগ, রাষ্ট্র বনাম গোর্খা জাতিসত্ত্বার এই সম্মুখ সমরের পরিবেশে আপাতত বিরোধ ভুলে জাতিসত্ত্বার আন্দোলনকে জোরদার করতে একটি আলাদা রাজ্যপন্থী জোট গঠনের দিকেও অগ্রসর হতে পারে। প্রস্তাবিত গোর্খাল্যাণ্ডের সীমানাকে তিস্তার পূর্ব পারে ডুয়ার্স ও পশ্চিম পারে তরাই অঞ্চলের ৩৯৬টি মৌজায় প্রশস্ত করার অভিমুখ ডুয়ার্স ও তরাই অঞ্চলে ২০০৭ পরবর্তী সময়ে আদিবাসী ও অন্যান্য ভাষাগোষ্ঠীর মানুষের প্রবল প্রতিরোধের মুখে পড়ে। গোর্খা বিরোধী দল হিসেবে আদিবাসী বিকাশ পরিষদ যেমন চা বাগান অধ্যুষিত ডুয়ার্স অঞ্চলকে ষষ্ঠ তফসিলে অন্তর্ভুক্তির দাবি নিয়ে স্বশাসন চাইছে, তেমনি তরাই অঞ্চলে বাংলা-ও-বাংলা ভাষা বাঁচাও কমিটি, আমরা বাঙালি, রাষ্ট্রীয় শিবসেনার মত সাম্প্রদায়িক দলগুলো সমতলে একটি অংশের মানুষের জাত্যাভিমানকে উস্কে দিতে পেরেছে। পাহাড়ে মোর্চার ডাকা অনির্দিষ্টকালীন বন্ধ কর্মসূচীর পাল্টা এদের ডাকা শিলিগুড়ি মহকুমা বন্ধ আবার নতুন করে জাতিদাঙ্গার পরিবেশ তৈরী করছে। বিগত দিনের বামফ্রন্টের নির্বাচনী কৌশলকে আত্মগত করেছেন মমতা। সদ্যসমাপ্ত পঞ্চায়েত নির্বাচনে তৃণমূল দলের সাফল্যে উল্লসিত হয়ে একই কায়দায় আসন্ন লোকসভা নির্বাচনের আসরে ‘বাংলা ভাগ’ না হতে দেওয়ার শ্লোগান তুলে জাতি বিভাজনের রাজনীতিকে তিনি তুঙ্গে তুলে ধরছেন এবং আপাত সমর্থনও পেয়ে যাচ্ছেন। কিন্তু বিগত দিনের ঐতিহাসিক প্রেক্ষিত থেকে আজকের রাজনৈতিক চালচিত্রের কিছুটা ফারাক ঘটে গেছে দ্রুত। পঞ্চায়েত নির্বাচনে ডুয়ার্স অঞ্চলে আদিবাসী বিকাশ পরিষদের নেতৃত্বের মধ্যে ভাঙ্গনের মধ্য দিয়ে উঠে আসা বিমল-সুহৃদ জন বার্লার নেতৃত্বাধীন গোষ্ঠী ঝাড়খণ্ড মুক্তি মোর্চার নির্বাচনী প্রতীকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে কয়েকটি পঞ্চায়েতের দখল কায়েম করেছে এবং জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদের একটি আসন ছিনিয়ে নিয়েছে। পাশাপাশি প্রবল আদিবাসী বিরোধের মুখে দাঁড়িয়েও এখানে গোর্খা জনমুক্তি মোর্চা সমসংখ্যক পঞ্চায়েত দখল ও একটি জেলা পরিষদ আসন হাসিল করেছে। এই দুটি দলই আবার অনেক জায়গায় যৌথভাবে বিজয় মিছিল সংঘটিত করেছে। সুতরাং বুর্জোয়া সংসদীয় কাঠামোর মধ্যেই তাঁদের দাবি কিছুটা মান্যতা আদায় করে নিচ্ছে। গ্রেপ্তারের হুমকির মুখে দাঁড়িয়েও তাই বিমল গুরুংরা এখন তৃণমূল নেত্রীর হুমকির বিরুদ্ধে আলোড়নমুখী কর্মসূচী সাজাতে পারছেন—দুর্নীতি বা অপশাসনের বোঝা আপাতত নামিয়ে রেখে। বিমল গুরুং-দের মত সুবিধাবাদী নেতাদের পক্ষে তাঁদের নিজস্ব আখের গোছাতে এক্ষুনি কোনরকম মধ্যবর্তী আপোষ মীমাংসায় সম্মত হওয়া হয়ত সম্ভব নয়। লেনিন যেমন বলেছিলেন যে, ‘‘নিপীড়িত জাতির মধ্যে জাতিপ্রশ্নে সুবিধাবাদের প্রকাশ অবশ্যই দমনকারী জাতির মধ্যে যেমন, তার তুলনায় জোরালো হতে থাকবে’’—এটা যেমন প্রত্যক্ষ করা যায়, তেমনি একটি জাতিসত্ত্বা যত বিকশিত হয়, তার স্বাধীনতার আকাঙ্খাও তত বাড়তে থাকে। এই সংঘাতপূর্ণ পরিস্থিতিতে কমিউনিস্ট বিপ্লবীদের যেমন জাতিসত্ত্বার ওপর রাষ্ট্রীয় নিপীড়নের বিরোধিতা করতে হবে, সমান্তরালভাবে জাতিসত্ত্বার স্বাধিকারের আন্দোলনে নেতৃত্বকারী অংশের মধ্যে সুবিধাবাদী অংশটিকে চিনিয়ে দিয়ে শ্রেণী রাজনীতির প্রাধান্যমূলক অবস্থানের পক্ষে নিরন্তর সওয়াল করে যেতে হবে।

- অভিজিৎ মজুমদার

আজীবন বিপ্লবী কবি সাংবাদিক শহীদ সরোজ দত্ত স্মরণ

আজীবন আপসহীন বিপ্লবী, কবি, সাংবাদিক কমরেড সরোজ দত্ত-র ৪৩তম শহীদ দিবস পালন করা হল গত ৫ আগস্ট। প্রধান কর্মসূচী ছিল কলকাতার সুরেন্দ্রনাথ (কার্জন) পার্কে শহীদ নেতার আবক্ষ মূর্তির সামনে। পশ্চিমবঙ্গ গণসংস্কৃতি পরিষদ আয়োজিত ঐ স্মরণ অনুষ্ঠান হয়ে ওঠে ভাষ্যে-গানে যথাযোগ্য মর্যাদায় প্রাণবন্ত। শহীদ বেদীতে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা নিবেদনের মধ্য দিয়ে দিনের কর্মসূচীর সূচনা হয়। উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ গণসংস্কৃতি পরিষদের নেতৃবৃন্দ অমিত দাশগুপ্ত, নীতীশ রায় সহ সি পি আই (এম এল) পলিটব্যুরোর সদস্য কমরেড কার্তিক পাল, কমরেড ডি পি বক্সী, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্পাদক কমরেড পার্থ ঘোষ, রাজ্য স্ট্যান্ডিং কমিটি সদস্য কমরেড কল্যাণ গোস্বামী, পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পী কলাকুশলী সংঘের নেতা ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, আই পি সি এ-র নেতা অমিতাভ চক্রবর্তী, প্রাবন্ধিক মধুময় পাল, অধ্যাপক সলিল বিশ্বাস প্রমুখ বিশিষ্টজনেরা।

মন ছুঁয়ে যাওয়া সঙ্গীত পরিবেশন করেন তরুণ শিল্পী আকাশ দেশমুখ, প্রবীণ শিল্পী বিপ্লব বাগচী সহ শান্তনু ভট্টাচার্য, নীতীশ রায় ও বাবুনি মজুমদার।

প্রথমে বক্তব্য রাখেন মধুময় পাল। তিনি সরোজ দত্তের আপসহীন লেখক কবি ভূমিকা স্মরণ করে তাঁর হত্যাকান্ডের তীব্র ধিক্কার জানান। পরবর্তী বক্তা কার্তিক পাল তাঁর বক্তব্যে সরোজ দত্তের হত্যা সহ কাশীপুর-বরাহনগর-বারাসত হত্যাকান্ডের সাথে সাথে নন্দীগ্রাম গণহত্যার বিচারের দাবি তুলে ধরেন। তিনি আরও বলেন, আজও যেভাবে গণতন্ত্র ও মানবাধিকার লঙ্ঘন করা হচ্ছে সরোজ দত্ত বেঁচে থাকলে এর বিরুদ্ধে তাঁর লেখনীর মধ্য দিয়ে যুব শক্তিকে জাগিয়ে তুলতেন। তিনি বলেন, প্রসঙ্গত বাংলাদেশের শাহবাগ আন্দোলন আমাদের প্রেরণা জোগায়, পশ্চিমবঙ্গেও হত্যাকারিদের বিচারের দাবিতে নতুন করে আন্দোলন গড়ে তোলা দরকার। সারা ভারত প্রগতিশীল মহিলা সমিতির নেত্রী শুক্লা সেন বলেন, আন্দোলনকে দমন করার পন্থা সত্তর দশকের মতোই আজও সমানভাবে চলছে। সরোজ দত্তের সাহিত্য আজও সমাদৃত। ''আজকের দেশব্রতী'' সম্পাদক অনিমেষ চক্রবর্তী বলেন, সরোজ দত্ত দুটো বিশেষ দিক থেকে প্রতীক হয়ে রয়েছেন, একটা দিক হল, আপসহীন কমিউনিস্ট আন্দোলনে অবিচল থাকা, যা তিনি তাঁর কাব্যিক ছন্দের মাধ্যমে উল্লেখ করেছেন ''দুঃসাহসী বিন্দু আমি বুকে বহি সিন্ধুর চেতনা''; অন্যদিকে তিনি স্বৈরতন্ত্রের আক্রমণের সামনে আপসহীন থেকে শহীদ হওয়ার প্রতীক। আমাদের বিপ্লবী দিশায় অবিচল থাকতে সবসময় কমরেড সরোজ দত্তের শিক্ষাকে স্মরণ ও পাথেয় করতে হবে। সি পি আই (এম এল) রাজ্য কমিটি সদস্য মলয় তেওয়ারি উল্লেখ করেন, বিগত বামফ্রন্ট আমলে কমরেড সরোজ দত্তের শহীদ দিবস পালন করতে গিয়ে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদের আন্দোলনের উপর পুলিশী হামলা গণতন্ত্রকে হত্যার অন্ধকার দিনকেই মনে করিয়ে দেয়। এখন আবার পঞ্চায়েত নির্বাচনকে কেন্দ্র করে খুন-সন্ত্রাস চালিয়েও মুখ্যমন্ত্রী 'গণতন্ত্রের উৎসব' হল বলে যখন আখ্যা দিচ্ছেন তখন গণতন্ত্রের জন্য লড়াইয়ের প্রাসঙ্গিকতা আবার খুব জোরালোভাবেই সামনে আসছে। ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কমরেড সরোজ দত্তের ঐতিহাসিক বিপ্লবী ভূমিকাকে স্মরণ করে বলেন, আজকের পরিস্থিতিতে গণতন্ত্রের উপর হামলার বিরুদ্ধে, হিংস্রতা-বর্বরতা-সন্ত্রাস-সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে, বাজারসর্বস্ব ভোগবিলাসের প্রভাব-পরিবেশ থেকে মানুষকে বের করে নিয়ে আসতে বামপন্থী সাংস্কৃতিক শক্তিগুলোকে ঐক্যের উপর জোর দিতে হবে। অমিতাভ চক্রবর্তীও অনুরূপ ঐক্যের আহ্বান রাখেন। সবশেষে পার্থ ঘোষ বলেন, প্রশ্নহীন কোন জীবনকে মেনে না নেওয়ার প্রতীক হলেন সরোজ দত্ত। তিনি বলেন, ভারতবর্ষে বহুবিধ সমস্যা থাকলেও রাষ্ট্র সবচেয়ে বেশী ভয় পায় নকশালপন্থাকে, কারণ তা সততা-সাহসী প্রতিবাদ-অগ্রণী মূল্যবোধের রাজনীতি। সরোজ দত্ত নিজের জীবন দিয়ে তা প্রমাণ করে গেছেন। আজও এদেশে সত্তর দশকের গণহত্যার মতোই শিখবিরোধী দাঙ্গার, গুজরাতে সংখ্যালঘুদের গণহত্যার, নন্দীগ্রাম গণহত্যার কোন বিচার হয়নি। রাষ্ট্র বিচার করতে ভয় পেয়েছে, কিন্তু জবাব দিতেই হবে এইসমস্ত হত্যার। ৩৪ বছরের শাসক বামেরাও হত্যা-সন্ত্রাস চালিয়েছিল, আর এখন যারা ক্ষমতায় তারাও সন্ত্রাস-হত্যা চালাচ্ছে। সত্তরের রক্তাক্ত অধ্যায়—খুনীদের বিচার চায়।

সরোজ দত্তের স্মরণ কর্মসূচীতে বক্তব্য রাখছেন পশ্চিমবঙ্গ গণসংস্কৃতি পরিষদের যুগ্ম সম্পাদক নীতীশ রায়। মঞ্চে বসে কার্তিক পাল ও অমিত দাশগুপ্ত। একেবারে বাঁদিকে ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

স্মরণ কর্মসূচীর পরিসমাপ্তি ঘোষণা করা হয় গণসংস্কৃতি পরিষদের দুই যুগ্ম সম্পাদক নীতীশ রায় ও (সভা সঞ্চালক) অমিত দাশগুপ্তের সমাপ্তি ভাষণের মধ্য দিয়ে। তাঁরা উপস্থিত সকলকে এই কমসূচী সার্থক করে তোলার জন্য অভিনন্দন জানানোর সাথে কমরেড সরোজ দত্ত, চারু মজুমদার সহ সত্তর দশকের সমস্ত হত্যাকান্ডের বিচারের দাবির পুনর্ঘোষণা করেন।

স্মরণসভা থেকে ঘোষণা করা হয় ১৩ আগস্ট কাশীপুর-বরাহনগর গণহত্যার দিবসে উত্তর কলকাতার সিঁথি মোড়ে শহীদ স্মরণ কর্মসূচীতে সামিল হোন।

কলকাতার বিভিন্ন এলাকায় ও শিলিগুড়িতে সরোজ দত্তের শহীদ স্মরণ

কলকাতার কলেজ স্ট্রীট, ভবানীপুর, বেহালার বনমালী ঘোষাল রোড, সিরিটি কালীতলা ও পূর্ব বেহালার মুচিপাড়া এলাকায় কমরেড সরোজ দত্তের শহীদ বেদীতে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়।

শিলিগুড়িতে পার্টির দার্জিলিং জেলা কার্যালয়ে সরোজ দত্তের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান সহ শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়। বক্তব্য রাখেন জেলা সম্পাদক অভিজিৎ মজুমদার, কল্লোল চক্রবর্তী, মোজাম্মেল হক ও মুক্তি সরকার।

নারীর নির্ভয় স্বাধীনতার দাবিতে চুঁচুড়ায় স্মারক বক্তৃতা সভা

গত ৪ আগস্ট চুঁচুড়া জেলা পরিষদ ভবনে শঙ্কর ব্যানার্জী স্মরণ কমিটির পক্ষ থেকে স্মারক বক্তৃতার আয়োজন করা হয়। বিষয় ছিল ''নারীদের চাই নির্ভয় স্বাধীনতা''। বর্তমান সময়ে নারীদের ওপর ঘটে চলা ক্রমবর্ধমান অত্যাচারের পরিপ্রেক্ষিতে প্রাসঙ্গিক এই বিষয়ে আলোচনা উপস্থিত শ্রোতারা আগ্রহের সাথে শোনেন এবং প্রশ্নোত্তর পর্বে তাঁদের অনেকেই অংশগ্রহণ করেন। গ্রামীণ মেহনতী মহিলা ও পুরুষদের সাথে সাথে শহরাঞ্চলে মেহনতী মানুষ এবং চুঁচুড়া শহরের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর এক সংবেদনশীল অংশ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। কমিটির অন্যতম আহ্বায়ক সনৎ রায়চৌধুরীর প্রারম্ভিক কথনে আলোচনা শুরু হয়। দিল্লীর নির্ভয়া, কামদুনির অপরাজিতা ও উত্তরাখণ্ডের দুর্যোগে নিহত মানুষদের স্মৃতিতে উপস্থিত সকলে নীরবতা পালন করেন। সংস্কৃতিপ্রেমী শঙ্করের (শঙ্কু) স্মৃতিতে সঙ্গীত পরিবেশন করেন গৌতম ঘোষ, সুতপা ব্যানার্জী, অগ্নিবীণা সাংস্কৃতিক সংস্থা, আবৃত্তি পরিবেশন করেন কিশোর চক্রবর্তী এবং রবীন্দ্রনাথের ''স্ত্রীর পত্র'' থেকে সংক্ষেপিত অংশ উপস্থাপিত করেন চুঁচুড়া সাংস্কৃতিক সংস্থার শিল্পীরা। শঙ্কুর দিদি নারী আন্দোলনের সংগঠক কৃষ্ণা বন্দ্যোপাধ্যায় শঙ্কুর কিশোর বয়সে নকশালবাড়ি আন্দোলনে যোগদান আর তারপর থেকে ধারাবাহিকভাবে কমিউনিস্ট ও বামপন্থী আন্দোলনে সামিল থাকার সংক্ষিপ্ত স্মৃতিচারণ করেন। স্মারক বক্তৃতার অন্যতম প্রধান বক্তা শাশ্বতী ঘোষ তাঁর বিস্তৃত বিশ্লেষণে ভার্মা কমিশনের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো তুলে ধরেন। রাষ্ট্রের নিরাপত্তা প্রদানের ভূমিকা অস্বীকার করা ও সুরক্ষা প্রদানের নামে নারীর অর্জিত অধিকার কেড়ে নিয়ে দয়ার পাত্রী হিসাবে নারীকে তুলে ধরার প্রচেষ্টার তীব্র বিরোধিতা করেন। হাওড়া জগাছার ধর্ষিতা সেলিনার বোন সাকিনা পুলিশী গাফিলতি ও দোষীকে আড়াল করার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ঘটনা শোনান। সভাঘরে উপস্থিত এরকম অপর এক ভুক্তভোগী হুগলী রায়বাজারের ধর্ষিতা গৃহবধুর শাশুড়ি যেন তাঁরই অভিজ্ঞতার কথা শুনছিলেন। অপর বক্তা সি পি আই (এম এল)-এর রাজ্য সম্পাদক পার্থ ঘোষ পরিসংখ্যানের মাধ্যমে মহিলাদের দুর্দশার চিত্র তুলে ধরেন। তিনি ধর্ষণের ক্ষেত্রে তা হয়েছে কি হয়নি সে বিষয়ে ডাক্তারদের 'নিদান' দেওয়া 'টু ফিঙ্গার টেস্ট' এবং পুলিশ ও মিলিটারি অফিসার কর্তৃক ধর্ষণের বিচার শুরুর ক্ষেত্রে সরকারি অনুমতি বাতিলের দাবি রাখেন। পুলিশের হেফাজতে ধর্ষণের ঘটনাগুলো তুলে ধরে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধেও ঐক্যবদ্ধ লড়াইয়ের গুরুত্বের কথা স্মরণ করান। শেষ বক্তা সারা ভারত প্রগতিশীল মহিলা সমিতির রাজ্য সম্পাদিকা চৈতালী সেন কামদুনীতে মহিলাদের প্রতিবাদী ভূমিকাকে অভিনন্দিত করেন। ''চোপ'' পরিঘটনার উল্লেখ করে তিনি বলেন শাসকদের এবার চুপ করার সময় এসেছে, এবার কথা বলবেন প্রতিবাদী জনগণ। সমগ্র অনুষ্ঠানটি সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করেন স্মরণ কমিটির আহ্বায়ক স্বপন গুহ।

বক্তব্য রাখছেন নারী আন্দোলনের অন্যতম সংগঠক শাশ্বতী ঘোষ।

সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতা-বর্জিত দেশপ্রেম, বীরত্ব ও আত্মত্যাগের অমর কথা ঃ গদর আন্দোলন

অত্যাচারী বৃটিশ রাজের বিরুদ্ধে শত শত সংগ্রাম গড়ে তুলেছিলেন ভারতবর্ষের মানুষ। কিন্তু যাঁরা পেটের দায়ে সেনাবাহিনীতে যোগ দিয়ে বৃটিশ সাম্রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে (যেমন সিঙ্গাপুরে) কর্মরত ছিলেন? অথবা ভিন দেশে গিয়ে বসতি স্থাপন করেছিলেন? না, তাঁরাও দূরে থাকেননি মাতৃভূমির মুক্তিসংগ্রাম থেকে। এই ধারার সবচাইতে সংগঠিত ও বৃহৎ আন্দোলন ছিল গদর (বিদ্রোহ)। এ বছর (২০১৩-১৪) তার শতবর্ষ উপলক্ষ্যে আসুন আমরা আরও একবার তাকাই সেই মহান আন্দোলনের দিকে।

উত্তর আমেরিকায় বসবাসকারী ভারতীয়দের, বিশেষভাবে পাঞ্জাবি সম্প্রদায়ের মধ্যে থেকেই জেগে ওঠে এই অনন্যসাধারণ আন্দোলন এবং পরে তা পরাধীন মাতৃভূমিকে মুক্ত করার মহান আবেগের সাথে ভারতবর্ষেও ছড়িয়ে পড়ে। বিংশ শতকের প্রথম দশকে ঋণের বোঝার চাপে জমি বিক্রি করে দিতে বাধ্য হওয়া বহু সংখ্যক দরিদ্র কিন্তু যথেষ্ট উদ্যমী পাঞ্জাবি কৃষক, বেকার কৃষিমজুর, কারিগর ও শ্রমিক জীবিকার সন্ধানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডায় যান। অনেককেই ঐ দেশগুলোতে ঢুকতে দেওয়া হয় না; আর যাঁরা সেখানে ঢুকে বসবাস করতে পেরেছিলেন তাঁদেরও নিয়মিতভাবেই বর্ণবাদী ঘৃণা, বৈষম্য এবং এমনকি শারীরিক নিগ্রহেরও মুখোমুখি হতে হত; এই নিপীড়নগুলো এখনও দেখা গেলেও তখন তা ঘটেছিল আরও ব্যাপক আকারে। ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের কাছে বারবার আবেদন জানানো হয়েছিল যে, তাঁরা যেন অভিবাসীদের তরফে মার্কিন ও কানাডার সরকারের সঙ্গে আলোচনা করে বিষয়টির ফয়সালা করেন, কিন্তু ঐ আবেদনে কোন কাজ হয় না। ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ বরং এই বিধিনিষেধ ও আক্রমণগুলোকে উৎসাহিত করত, কেননা তারা চায়নি যে তাদের প্রজারা বেশি বেশি সংখ্যায় ইউরোপ ও আমেরিকায় গিয়ে মুক্তি ও সমাজতন্ত্রের আদর্শে 'প্রভাবিত' হোক।

অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিয়ে এবং দেশের মধ্যেকার জাতীয় বিপ্লবীদের কর্মকাণ্ডের তীব্রতা বৃদ্ধিতে অনুপ্রাণিত হয়ে (বিশেষভাবে উল্লেখ্য, দিল্লীতে ১৯১৩-র ২৩ ডিসেম্বর ভারতের বড়লাট লর্ড হার্ডিঞ্জের ওপর বোমা মারার ঘটনা) অভিবাসী সম্প্রদায়ের এই দৃঢ় উপলব্ধি হল যে, সশস্ত্র বিদ্রোহই হল মাতৃভূমিকে মুক্ত করার একমাত্র পথ। এই মতবাদ যাঁরা প্রথম প্রচার করেন তাঁদের অন্যতম ছিলেন ভগবান সিং, যিনি ১৯১৩-র গোড়ার দিকে ভ্যাঙ্কুভারে গিয়েছিলেন এবং অল্প কিছুদিন পরই কানাডা সরকার যাঁকে বহিষ্কার করে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে শুরু হয় সোহন সিং ভাকনা, লাল হরদয়াল, ভাই প্রেমানন্দ ও অন্যান্যদের নেতৃত্বে আরও দীর্ঘস্থায়ী ও ব্যাপক-ভিত্তিক আন্দোলন। পোর্টল্যাণ্ডে ১৯১৩-র মে মাসে ''পশ্চিম উপকূলের হিন্দি অ্যাসোসিয়েশনের' উদ্বোধনী বৈঠকে হরদয়াল—যিনি নৈরাজ্যবাদী-সিণ্ডিক্যালপন্থী ''বিশ্বের শিল্প শ্রমিকদের'' সান ফ্রান্সিসকো শাখার সম্পাদক হিসেবে কাজ করেছিলেন এবং সম্ভবত প্রথম ভারতীয় যিনি কার্ল মার্কস সম্পর্কে প্রবন্ধ লিখেছিলেন (যেটি কলকাতার *মডার্ণ রিভিউ* পত্রিকায় ১৯১২-র মার্চে প্রকাশিত হয়)—এই কর্মসূচীকে তুলে ধরেন ঃ ''আমেরিকাবাসীদের বিরুদ্ধে লড়াই কোরো না, বরং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পাওয়া স্বাধীনতাকে কাজে লাগিয়ে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে লড়াই কর; নিজেদের দেশে স্বাধীন না হলে আমেরিকার মানুষজন কখনই তোমাদের তাদের সমান বলে মনে করবে না; ভারতের দারিদ্র ও অবনমনের মূলে রয়েছে ব্রিটিশ শাসন এবং তাকে উৎখাত করতে হবে, আবেদন-নিবেদনের মাধ্যমে নয়, সশস্ত্র বিদ্রোহের মধ্যে দিয়ে; জনগণ এবং ভারতীয় সেনা বাহিনীর সৈনিকদের কাছে এই বার্তা পৌঁছে দাও; ব্যাপক সংখ্যায় ভারতে যাও ও তাদের সমর্থন লাভ কর।''

সবাই এতে সায় দিল এবং সান ফ্রান্সিসকোয় *যুগান্তর আশ্রম* নামে সদর দপ্তর (বাংলার বিখ্যাত জাতীয় বিপ্লবী গোষ্ঠীর নামানুসারে যে নামকরণ হয়) প্রতিষ্ঠিত হয়; *গদর* নামে সাপ্তাহিক পত্রিকা সে বছরের নভেম্বর মাস থেকে প্রকাশিত হতে থাকে, প্রথমে উর্দু ও গুরুমুখিতে এবং ক্রমে ক্রমে অন্যান্য কিছু ভারতীয় ভাষাতেও। দ্রুতই আন্দোলন অত্যন্ত জনপ্রিয় এই পত্রিকার নামেই পরিচিত হয়ে ওঠে।

গদর পত্রিকা ধারাবাহিকভাবেই ভারতে ব্রিটিশ শাসনকে উন্মোচিত করে চলে এবং অরবিন্দ, সাভারকার, তিলক, অজিত সিং, সুফি অম্বা প্রসাদ, ম্যাডাম কামা প্রভৃতি বিপ্লবী জাতীয়তাবাদীদের বক্তব্য ও কর্মকাণ্ডকে প্রচার করতে থাকে। পত্রিকা বাংলা এবং ভারতের অন্যান্য স্থানের বিপ্লবী জাতীয়তাবাদীদের দুঃসাহসী কর্মকাণ্ডকে তুলে ধরতে থাকে। বিপ্লবী উদ্দীপনা ছাড়াও পত্রিকায় প্রকাশিত বিভিন্ন রচনা ও কবিতা (যা *গদর দি গুঞ্জ* বা বিদ্রোহের আহ্বান নামে আলাদাভাবে প্রকাশিত হত) এক দৃঢ় ধর্মনিরপেক্ষতাকে ব্যক্ত করত যা জাতীয়তাবাদী আলোচনা ধারায় প্রায়শই প্রকাশ পাওয়া হিন্দু ধর্মীয় ব্যঞ্জনার সম্পূর্ণ বিপরীতে দাঁড়িয়ে উজ্জ্বল হয়ে উঠত।

১৯১৪ সালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলে গদরপন্থীরা ব্রিটেনের বিপত্তিকে ভারতের সুযোগে পরিণত করার সিদ্ধান্ত নিলেন। ১৯১৪-র মাঝামাঝি *কোমাগাটা মারু*-র ঘটনা তাদের আবেগকে আরও উদ্দীপিত করে তুলল। *কোমাগাটা মারু* নামে এক জাহাজ ৩৭৬ জন ভারতীয় যাত্রীকে নিয়ে (মূলত পাঞ্জাবি শিখ ও মুসলিম) ভ্যাঙ্কুভার বন্দরে পৌঁছলে—কানাডায় অভিবাসী হওয়ার জন্য যাঁরা যাচ্ছিলেন—ঐ বন্দর থেকেই জাহাজটিকে ফেরত পাঠিয়ে দেওয়া হয়। কানাডায় যাওয়া ও সেখান থেকে ফিরে আসার মাসাধিক সময়কালে জাহাজটি যে সমস্ত বন্দরে থামে সেখানে গদর আন্দোলনের কর্মী ও অন্যান্যরা বক্তৃতা ও বিক্ষোভ সংগঠিত করে হয়রানির শিকার হওয়া যাত্রীদের প্রতি সংহতি জ্ঞাপন করেন। এক নাগাড়ে ক্লান্তিকর যাত্রার পর জাহাজটি ১৯১৪-র ২৯ সেপ্টেম্বর গঙ্গা নদীর ধারে কলকাতার কাছে বজবজ পৌঁছয়। এরপর পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষ শুরু হয়, ২০ জনের মত যাত্রী নিহত হন ও ২০২ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়।

এইরকম এক অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতিতে *গদর* পত্রিকা এইলান-ই-জং-এর (যুদ্ধের ঘোষণা) ডাক দেয়। নেতৃবৃন্দ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডায় একের পর এক জনসভার আয়োজন করে ভারতবাসীদের কাছে মাতৃভূমিতে ফিরে গিয়ে সশস্ত্র বিদ্রোহ সংগঠিত করার আহ্বান জানান। কিছু কুশলী নেতৃবৃন্দকে পাঠানো হয় জাপান, চীন, ফিলিপাইনস ইত্যাদি দেশে, উদ্দেশ্য—এই সমস্ত দেশের ভারতীয়দের কাছে একই কাজ করার আহ্বান জানানো। এই আহ্বানে সাড়া দিয়ে প্রায় ৮,০০০ ভারতীয় অভিবাসী দেশে ফিরে আসেন। এদের মধ্যে যারা ''সবচেয়ে বিপদজনক'', ভারত সরকার তাদের গ্রেপ্তার করে এবং আরও অনেককে তাদের গ্রামের মধ্যে আটকে রাখা হয়। অন্যরা অনেক জায়গায় গিয়ে বক্তৃতা দেন ও জনগণকে জাগিয়ে তোলার চেষ্টা করেন, কিন্তু সশস্ত্র অভ্যুত্থানের আহ্বানের প্রতি সাধারণ পাঞ্জাবি কৃষকরা খুব উৎসাহ নিয়ে সাড়া দেননি। এর ওপর আবার মুখ্য খালসা দেওয়ান গদর আন্দোলনের অনুগামীদের 'অধঃপতিত' শিখ ও দুর্বৃত্ত বলে অভিহিত করেন এবং তাদের খুঁজে বার করতে কর্তৃপক্ষকে সহায়তা করে পরিস্থিতিকে প্রতিকূল করে তোলেন। সেনা বাহিনীর শিখ শাখাগুলোকে বিদ্রোহে উঠে দাঁড়ানোর ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করার কিছু প্রচেষ্টা ১৯১৪-র শেষ দিকে নেওয়া হলেও সেগুলো সফল হয়নি।

এরপর গদর আদোলনের নেতৃবৃন্দ রাসবিহারী বোসকে অনুরোধ করেন পাঞ্জাব, উত্তরপ্রদেশ ও অন্যান্য কয়েকটি স্থানে একই দিনে সেনা বাহিনীর কয়েকটি শাখার মধ্যে বিদ্রোহ ঘটানোর ব্যাপারে তিনি যেন সাহায্য করেন। কিন্তু এই পরিকল্পনা ফাঁস হয়ে যায় এবং নেতৃবৃন্দের অধিকাংশই গ্রেপ্তার হয়ে যান; রাসবিহারী বোস অবশ্য জাপানে পালিয়ে যেতে সক্ষম হন। ইতস্তত বিক্ষিপ্ত কয়েকটি বিদ্রোহকে নির্মমভাবে দমন করা হয়, যথা, সিঙ্গাপুরে যেখানে ৪১ জনকে ফাঁসি দেওয়া হয় এবং ১৯১ জনকে সশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হয় বা আন্দামানের কুখ্যাত সেলুলার জেলে স্থানান্তরিত করা হয়। ষড়যন্ত্রের কয়েকটি মামলা ভারতে চালানো হয় (যথা, লাহোর, ম্যানড্‌লে ইত্যাদি স্থানে) যাতে ৪৫ জন গদর নেতৃবৃন্দের বিরুদ্ধে ফাঁসির আদেশ হয় এবং ২০০-র বেশী নেতাকে দীর্ঘ কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। এরপর চেষ্টা চালানো হয় বিদেশস্থিত ভারতীয় সেনাদের মধ্যে বিদ্রোহ সংগঠিত করার, এবারও তা ব্যর্থ হয়।

তার আপাত ব্যর্থতা সত্ত্বেও গদর আন্দোলন সমস্ত ভারতীয় অভিবাসীদের মধ্যে—শুধু উত্তর আমেরিকাতেই নয়, অন্যান্য দেশেও—ব্যাপক দেশাত্মবোধ ও আত্মত্যাগের মানসিকতাকে জাগিয়ে তুলতে সক্ষম হয় যা প্রতিষ্ঠিত ছিল শক্তিশালী ধর্মনিরপেক্ষ, গণতান্ত্রিক ও সমানাধিকারের ভিত্তির ওপর। নেতৃবৃন্দের মধ্যে ছিলেন ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের শিখ, মুসলিম (উদাহরণস্বরূপ, বরকুতুল্লা) ও হিন্দু (যথা, হরদয়াল ও বোস)। শিখ ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের মধ্যে *সৎ শ্রী আকাল*-এর বদলে *বন্দেমাতরম* বলে অভিবাদন জানানোটাই ছিল সাধারণ রীতি। সোহন সিং ভাকনা—যিনি ছিলেন সর্বোচ্চ নেতৃবৃন্দের অন্যতম এবং পরবর্তীতে সি পি আই-এর এক গুরুত্বপূর্ণ নেতা হয়ে ওঠেন—যেমন পরবর্তীতে বলেছিলেন, ''আমরা শিখ বা পাঞ্জাবি ছিলাম না। আমাদের ধর্ম ছিল দেশপ্রেম।'' একই বোধ ধ্বনিত হয়েছিল তরুণ আবদুল্লার কণ্ঠে, বিদ্রোহী যে সিপাইকে আম্বালায় ফাঁসি দেওয়া হয়। তাঁর *কাফের* (অ-মুসলিম) কমরেডদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করার প্রলোভন কর্তৃপক্ষ দেখালে তিনি মুখের ওপর জবাব দিয়েছিলেন, ''এই মানুষগুলোর সঙ্গেই আমার জন্যে স্বর্গের দরজা খুলবে।''

গদর নেতৃবৃন্দ ও ঐ আন্দোলনের কর্মীরা প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধকে যথেষ্ট শ্রদ্ধার চোখেই দেখতেন। তাঁরা মনে করতেন, পাঞ্জাবিরা —বিশেষভাবে শিখরা—ব্রিটিশদের পক্ষে থেকে ১৮৫৭-র বিদ্রোহে দেশমাতার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতাই করেছিলেন আর এখন তাঁদের সেই ভুল শুধরে নিতে হবে। এক ব্যাপকতর আন্তর্জাতিকতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গীতে তাঁরা উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন এবং আয়ারল্যাণ্ড, মেক্সিকো এবং রাশিয়া ও তার সঙ্গে ভারতীয় বিপ্লবীরা তাঁদের অনুপ্রাণিত করেছিল। এই আন্দোলন ভবিষ্যৎ প্রজন্মের দেশীয় ও বিদেশস্থিত ভারতীয়দের কাছে রেখে গেছে ঔপনিবেশিকতা ও সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে আপোষহীন সংগ্রামের এক গৌরবময় ঐতিহ্য। এই আন্দোলনকে আনুষ্ঠানিকভাবে ধ্বংস করার পরও এর মশালকে যাঁরা বয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন কমিউনিস্ট অগ্রদূত ভগৎ সিং, আর গদর নেতৃবৃন্দের অনেকেই পরবর্তীকালে কৃষক সংগঠক ও কমিউনিস্ট হয়ে ওঠেন।

আজ আমাদের দেশ যখন ঔপনিবেশিকতার শক্তিশালী রেশ দ্বারা ক্লিষ্ট হচ্ছে এবং সাম্রাজ্যবাদ, বৃহৎ পুঁজি ও নাছোড় সামন্ততান্ত্রিক অবশেষের নির্মম গাঁটছড়ার কবল থেকে মুক্ত হওয়ার অপেক্ষায় রয়েছে, তখন *গদর দি গুঞ্জ* এখনও আমাদের কানে অনুরণন তোলে। এই আন্দোলনের শতবর্ষ পূর্তিতে আমরা সি পি আই (এম এল)-এর সদস্যবৃন্দ গদর সৈনিকদের সাহসিকতা, অঙ্গীকার ও আত্মত্যাগের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করছি এবং যে লক্ষ্য পূরণে তাঁরা লড়াই করেছিলেন তার প্রতি নিজেদের পুনরায় উৎসর্গ করছি।

- অরিন্দম সেন

এ আই সি সি টি ইউ-র প্রথম পাঞ্জাব রাজ্য কনভেনশন

এ আই সি সি টি ইউ-র সর্বপ্রথম পাঞ্জাব রাজ্যস্তরের কনভেনশন সংগঠিত হল ২৮ জুলাই, কমরেড চারু মজুমদার ও কমরেড বাবা ভূজা সিং-এর শহীদ দিবসে।

এ আই সি সি টি ইউ অনুমোদিত বিভিন্ন ট্রেড ইউনিয়ন থেকে শতাধিক প্রতিনিধি এই কনভেনশনে প্রতিনিধিত্ব করেন। যেমন, পাঞ্জাব সুগার মিল ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন, টেক্সটাইল মজদুর ইউনিয়ন, ফাউন্ড্রি ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন, ক্রান্তিকারি কামকাজি মহিলা সংগঠন (চণ্ডীগড়), পি জি আই কন্ট্রাক্ট ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন, পি ই সি মেস এমপ্লয়িজ ইউনিয়ন, টি বি আর এল কন্ট্রাক্ট ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন, পি জি আই সাফাই কর্মচারি কন্ট্রাক্ট ইউনিয়ন, লাল ঝাণ্ডা ভাট্টা মজদুর ইউনিয়ন, নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন, এছাড়া প্যারামেডিকেল স্বাস্থ্য কর্মী, ডাক বিভাগের শ্রমজীবী ও মুটিয়া মজদুরদের মধ্যে থেকে প্রতিনিধিরা আসেন কনভেনশনে। উদ্বোধনী বক্তব্য রাখেন এ আই সি সি টি ইউ-র সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক কমরেড স্বপন মুখার্জী, এছাড়াও বিভিন্ন ভ্রাতৃপ্রতীম সংগঠনের আগত প্রতিনিধিরা বক্তব্য পেশ করেন, বলেন অখিল ভারতীয় কিষাণ মহাসভার মানসার সভাপতি রুলদু সিং, সারা ভারত প্রগতিশীল মহিলা সমিতির যশবীর কাউর নাট, মজদুর মুক্তি মোর্চার হরবিন্দর সিং সীমা আরও অনেকে। বিশেষত ভাষণ দেন সি পি আই (এম এল) লিবারেশনের পাঞ্জাব রাজ্য সম্পাদক রাজবিন্দর সিং রাণা। কনভেনশন আগামী দিনে কাজ চালানোর জন্য রাজ্য স্তরের একটি বডিও নির্বাচিত করেছে যার সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষ নির্বাচিত হয়েছেন যথাক্রমে কমরেড গুরমিৎ সিং ভক্তপুরা, গুরুপ্রীত সিং রুরকে ও কমরেড সতীশ কুমার।

বিপ্লবী বামপন্থার বার্তাবহ
আজকের দেশব্রতী পড়ুন

ইতিহাসের পাতা থেকে

বাংলার পার্টি প্রভাবিত শিল্প সাহিত্যে শোধনবাদীদের ভূমিকা

।। সরোজ দত্ত।।

(৫ আগস্ট ছিল আজীবন কমিউনিস্ট বিপ্লবী অগ্রণী নেতা ও প্রবাদপ্রতীম কবি-সাংবাদিক-প্রাবন্ধিক সরোজ দত্তের ৪৩তম শহীদ দিবস। এই উপলক্ষে তাঁর প্রায় অর্ধশতক সময় আগে লেখা একটি মূল্যবান প্রবন্ধ প্রকাশ করা হল বিশেষত নতুন প্রজন্মের কথা ভেবে। এ এমন এক সময় যখন সাম্রাজ্যবাদ নিয়ন্ত্রিত বিশ্বায়নের আগ্রাসন এমনকি শিল্পসাহিত্যকেও একচেটিয়া প্রভাবিত করতে সক্রিয়। যুগ আর সময়ের এই দিকটাকে বুঝতে মৌলিক রসদ মিলাবে আশা রেখে রচনাটি পুনঃপ্রকাশের সিদ্ধান্ত। - সম্পাদকমণ্ডলী)

''সন্ধ্যাদীপ জ্বালানোর আগে সকালবেলায় সলতে পাকানোর মতো'' ভূমিকা হিসাবে কয়েকটা কথা বলা দরকার। আজ থেকে পঁয়ত্রিশ বছর আগেকার কথা। বিশ্বধনতন্ত্র তখন তীব্র সঙ্কটের আবর্তে পড়েছে, দেখা দিয়েছে বিশ্ব বাণিজ্যিক মন্দা। বিশ্বধনতন্ত্রের মূল ঘাঁটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এ সঙ্কটের অভিব্যক্তি স্বভাবতই তখন প্রকটতম। বেকারের সংখ্যা বেড়ে চলেছে হু হু করে দিনের পর দিন, দলে দলে দিশেহারা মানুষ ঘুরে বেড়াচ্ছে অন্ন ও কাজের সন্ধানে, সঙ্গে সঙ্গে বেড়ে চলেছে মস্তিষ্কবিকৃতি, আত্মপীড়ন, আত্মক্ষয়, আত্মহত্যা ও যৌন উদ্‌ভ্রান্তি। অগ্রসর-অনগ্রসর প্রত্যেক পুঁজিবাদী দেশেরই তখন অল্পবিস্তর এ অবস্থা। ওদিকে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে পৃথিবীর এক ষষ্ঠমাংশে; সে এলাকা সঙ্কট থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত এবং পরামাশ্চর্য উদ্দীপনা ও আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে দেশের অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের কাজ হাতে নিয়েছে। সাজ সাজ রব পড়ে গেল পুঁজিবাদী শাসকমহলে। পাছে সোভিয়েতের জীবন্ত দৃষ্টান্ত ও বৈপ্লবিক সমাজতান্ত্রিক ভাবধারা পুঁজিবাদী দুনিয়ার জনজীবনে পরিব্যপ্ত হয়ে পড়ে তাই একদিকে যেমন তারা কঠোর পুলিশী ব্যবস্থার আশ্রয় নিলেন, অন্যদিকে তেমন পাল্টা প্রচারের জন্য ভাড়াটিয়া লেখকদের নিয়োগ করলেন। প্রকাশিত হল মুমূর্ষু ধনতন্ত্রের মকরধ্বজরূপ কেইন্‌সের অর্থনীতি, পূর্ণমাত্রায় কাজে লাগানো হল বস্তুবাদের মোড়কে ভাববাদী ফ্রয়েডীয় দর্শনকে, বিক্ষোভ পাছে বিপ্লবী রূপ নেয় তাই শিল্পসাহিত্যে সর্বপ্রকারের বুর্জোয়া অবক্ষয়ী চিন্তাকে বিপ্লবীয়ানার ছদ্মবেশ পরিয়ে উপস্থিত করা হল। বছর দশেক আগে জার্মান কমিউনিস্ট নেত্রী ক্লারা জেটকিনের সঙ্গে আলোচনাকালে লেনিন এ সম্পর্কে কঠোর সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছিলেন, বলেছিলেন এসব বিপ্লবীয়ানার সঙ্গে ''শ্রমিকশ্রেণীর কোনও সম্পর্ক নেই'' (প্রলেতারিয়েত হ্যাজ গট নাথিং টু ডু উইথ ইট)।

বলা বাহুল্য, ইংরেজ শাসিত উপনিবেশ ভারতবর্ষও তখন এই বিশ্বধনতান্ত্রিক সংকটের আবর্তে পড়েছে। সঙ্গে সঙ্গে রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সংকটও অনিবার্যভাবেই দেখা দিয়েছে। কয়েক বছর আগে ১৯২৫ সালে প্রাচ্য জনগণের বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা প্রসঙ্গে কমরেড স্তালিন উপনিবেশিক দুনিয়ার তদানীন্তন অবস্থা বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছিলেন, অন্যান্য উপনিবেশের তুলনায় ভারতবর্ষে ধনতন্ত্র অপেক্ষাকৃত পরিণত। এই পরিণত অবস্থার জন্য সংকট এখানে অপেক্ষাকৃত তীব্র হয়। বিদেশী পুঁজির পীঠস্থান বৃহত্তর কলকাতা তথা বাংলাদেশে সংকট যে বিশেষভাবে অনুভূত হবে তাতে বিস্ময়ের কিছু নাই। এ প্রবন্ধ বাংলাদেশের সংকটের ক্ষেত্রেই আমরা সীমাবদ্ধ রাখব। তখন আমাদের দেশে (এবং এখনও) শিল্পসাহিত্যের কারবারী মূলত শিক্ষিত পেটিবুর্জোয়াশ্রেণী। জমিদারশ্রেণীর যাঁরা দু-একজন এ কারবারে লিপ্ত ছিলেন তাঁরাও নির্ভরশীল ছিলেন এঁদেরই উপর। সেই শিক্ষিত পেটিবুর্জোয়াশ্রেণী ধনতান্ত্রিক সংকটে মারাত্মকভাবে আহত হয়ে দিশেহারা হয়ে গেলেন। এঁদের একাংশ ইতিপূর্বেই বিদেশী শাসন উচ্ছেদের জন্য পেটিবুর্জোয়াদের সশস্ত্র অভ্যুত্থানের পথ গ্রহণ করেছিলেন যা সামাজিক ঐতিহাসিক কারণে অনিবার্যভাবেই শোচনীয় ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। আর এক অংশ যাঁরা ছিলেন শিল্পসাহিত্যের তরুণ কারবারী, প্রচলিত ব্যবস্থার বিরুদ্ধে তাঁদের ক্রোধ ও ক্ষোভকে সাম্রাজ্যবাদী প্রচারের অপকৌশল বিভ্রান্ত ও বিপথগামী করে শেষপর্যন্ত নিজেদেরই স্বার্থসিদ্ধির সহায়তা করে তোলে।

সংকট দ্রুতভাবে এগিয়ে চলল। শিক্ষিত বেকারে দেশ ভরে গেল, মস্তিষ্ক-বিকৃতি ও আত্মহত্যার সংখ্যা বেড়ে চলল, অফিসে অফিসে তাদের ধর্ণা ও কাকুতি এবং লব্ধচাকুরি ভাগ্যবানদের পীড়িত পদানত ক্রীতদাসের জীবন আবহাওয়াকে সর্বক্ষণের জন্য ভারাক্রান্ত করে রাখল। এদিকে রাজনৈতিক গগনও ঘন মেঘে আচ্ছন্ন হয়ে উঠল। আপসকামী বুর্জোয়া নেতৃত্বের বিশ্বাসঘাতকতায় জাতীয় মুক্তি আন্দোলন তখন ভেঙে গেছে, সঙ্গে সঙ্গে নিভে গেছে সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের দীপশিখা। শিক্ষিত পেটিবুর্জোয়া চোখের সামনে তখন ভবিষ্যত বলতে একটা বিভীষিকার কালো পর্দা। দেশে বৈজ্ঞানিক সমাজতান্ত্রিক ভাবধারার প্রবেশপথ পুলিশী প্রহরায় শ্যেণ দৃষ্টিতে অবরুদ্ধ। কিন্তু যুদ্ধোত্তর ইউরোপের চমকপ্রদ প্রবেশ শুধু উন্মুক্ত নয়, বিশেষভাবে উৎসাহিতও বটে। হতাশা ও নৈরাশ্যের এই দিকচিহ্নহীন অন্ধকারে আমাদের তরুণ মসীজীবীরা বুকজ্বালা তৃষ্ণা মেটানোর জন্য আকণ্ঠ এই নর্দমার জল পান করতে লাগলেন। শ্বাসরোধকারী পরিবেশের বিরুদ্ধে তাঁদের সঙ্গত, স্বাভাবিক ও স্বতঃস্ফূর্ত বিক্ষোভকে সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রযন্ত্র ও প্রচারযন্ত্র কিভাবে বিকৃত ও বিভ্রান্ত করে নিজেদেরই স্বার্থসাধনে নিয়োজিত করল, তা তাঁরা টের পেলেন না। নয়া ইউরোপ থেকে তাঁরা বাংলা সাহিত্যে আমদানি করলেন অলডুস হাক্সলি, নুট হামসুন ও টি এস এলিয়টকে, গোর্কি, নেক্সো ও মায়াকোভস্কির সন্ধান তাঁরা পেলেন না। কল্লোল ও কালিকলম গোষ্ঠীর মধ্যে অবশ্য এমন সাহিত্যিক নিশ্চয়ই ছিলেন যাঁরা এই অপবিদ্রোহের মধ্যেও প্রকৃত বিদ্রোহের কিছুটা চেষ্টা করেছিলেন। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, শৈলজা মুখোপাধ্যায়, প্রেমেন্দ্র মিত্রকে এই পংক্তিতে ফেলা যায়। বিশেষ করে, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় এই অবক্ষয়কে গ্রহণ করেও কেমন যেন একটা অতৃপ্তি অস্থিরতা তাঁর থেকে গিয়েছিল; তিনি যেন সর্বক্ষণ পথ খুঁজছিলেন। তাই পরবর্তীকালে তিনি বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রবাদ গ্রহণ করে বাংলা কথাসাহিত্যে নতুন দিগন্ত উন্মোচিত করতে পেরেছিলেন।

এই শতকের চতুর্থ দশকের মাঝামাঝি থেকে বলা চলে অবস্থার পরিবর্তন হতে শুরু করল। বে-আইনি আত্মগোপনকারী কমিউনিস্ট পার্টির প্রভাব জাতীয় রাজনীতিতে এবং বিশেষভাবে পেটিবুর্জোয়া তরুণ সম্প্রদায়ের উপর পড়তে শুরু করল। একদিকে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সোভিয়েত ইউনিয়নের পাঁচশালা পরিকল্পনার অভাবিত সাফল্য, চীনের জাপবিরোধী সংগ্রাম ও স্পেনের গৃহযুদ্ধ এবং ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে একটা আন্তর্জাতিক গণবিক্ষোভ এবং জাতীয়ক্ষেত্রে রাজনৈতিকভাবে সংগঠিত শ্রমিক ও কৃষক আন্দোলনের সূচনা কমিউনিস্ট পার্টি ও তার মতাদর্শকে জনচিত্তে একটা মর্যাদার আসন দিল। ইংরাজের বন্দীশিবিরে শত শত তরুণ রাজবন্দীর একটা বিপুল বৃহদাংশ বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রবাদ গ্রহণ করলেন। ক্রমে তারা যখন বেরিয়ে এলেন তখন দেশের রাজনৈতিক আবহাওয়ায় একটা বড় রকমের পরিবর্তন ঘটল।

এই পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে বাংলাদেশের অবক্ষয়ী সাহিত্যিকদের ভূমিকা বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়। এক আত্মকেন্দ্রীক, গোষ্ঠীকেন্দ্রীক, জনবিদ্বেষী, অবাস্তব ও দুর্বোধ্য সাহিত্য সাধনার ফলে এঁদের অবস্থা ইতিমধ্যেই নিবে যাওয়া হাউই কাঠির মতো হয়ে এসেছিল। দেশে বিশেষত বাংলাদেশে কমিউনিস্ট পার্টি ও কমিউনিজমের মর্যাদা তখন ঊর্ধ্বমুখীন। কমিউনিজম তখন প্রায় একটা ফ্যাসন হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিলুপ্তির মুখে দাঁড়িয়ে পুনরুজ্জীবনের এমন সুযোগ তাঁরা ছাড়লেন না। তাঁদের মুখপাত্রেরা ঘোষণা করলেন যে তাঁরা কমিউনিস্ট পার্টি ও কমিউনিজমের দরদী ও সমর্থক। শুধু এইটুকু বললে ক্ষতি ছিল না বরং ভাবা যেত তাঁরা হয়ত নতুনভাবে সাহিত্য জীবন শুরু করার কথা ভাবছেন। কিন্তু তা নয়। তাঁরা বললেন যে তাঁদের অতীতের সমস্ত সাহিত্য সাধনাই কমিউনিজমের পরিপোষক। ১৯৩১ সালের শেষদিকে চীনের জাপবিরোধী সংগ্রাম ও স্প্যানিশ গৃহযুদ্ধের আন্তর্জাতিক উদ্দীপনার পরিপ্রেক্ষিতে কলকাতায় যে সারা ভারত প্রগতি সাহিত্য সম্মেলন হয় তাতে তাঁরা দুটি পঠিত প্রবন্ধে ঠিক এই কথাই ঘোষণা করেন।

এই প্রবন্ধের মোটমুটি বক্তব্য ছিল এই ঃ তাঁদের তৈরি সাহিত্যও একপ্রকার পণ্য, সাহিত্য-কারখানার মালিকেরা অর্থাৎ পুস্তক প্রকাশকেরা ও পত্রিকার স্বত্বাধিকারীরা এই পণ্য বিক্রি করে মুনাফা করছেন, কিন্তু তাঁরা উপযুক্ত প্রাপ্য পাচ্ছেন না। তাই তাঁরাও সর্বহারা প্রলেতারিয়েত; অতএব তাঁদের সাহিত্যও প্রলেতারীয় সাহিত্য। দ্বিতীয় প্রবন্ধটির নাম ইন ডিফেন্স অফ ডেকাডেন্টস্। অর্থাৎ অবক্ষয়ীদের সমর্থনে। এর বক্তব্য ছিল ঃ যেহেতু অবক্ষয় বর্তমানে বুর্জোয়া সমাজের একটা বাস্তবতা, অতএব একে চিত্রিত করাও (উদঘাটন ও আক্রমণ না করে---লেখক) বুর্জোয়া বিরোধী বিপ্লবীকতা। অতএব অবক্ষয়ী সাহিত্য কমিউনিজমের পরিপোষক। তখন মাসিক 'অগ্রণী' পত্রিকায় এই মতবাদের বুর্জোয়া সুবিধাবাদী রূপ উদ্‌ঘাটন করে বর্তমান লেখক প্রবন্ধ লেখেন এবং তার ফলে ঐ পত্রিকাতেই দীর্ঘ বিতর্কের সৃষ্টি হয়। বিতর্ক কিছুটা চলার পর অবক্ষয়বাদীরা বোধহয় বিপন্ন বোধ করেই চুপ করে যান। কিন্তু খিড়কির দ্বার দিয়েই এই দুষিত বুর্জোয়া অবক্ষয়ী ভাবধারা কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়ার চেষ্টা তাঁরা ত্যাগ করেন না এবং এই কাজে কমিউনিস্ট পার্টির কিছু 'সাংস্কৃতিক' নেতা তাঁদের সাহায্য ও সহযোগিতা করেন। দলপুষ্টির ব্যাপারে এরা এতই ব্যস্ত যে, মতবাদের লড়াইয়ে বিব্রত বোধ করতে থাকেন; তাছাড়া নিজেরাও তখন তাঁরা অবক্ষয়ী চিন্তাধারায় কিছুটা আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছেন। এঁদের ভাবখানা ছিল এই যে, এই অবক্ষয়ীরা যখন ''তাঁদের যুগেরই সৃষ্টি'' তখন তাদের আক্রমণ করা ঠিক নয়। এঁরা ছিলেন সবাই মার্কসীয় সাহিত্যের কেতাবী পণ্ডিত। কিন্তু তাঁরা সবাই কার্ল মার্কসের এই বিখ্যাত উক্তিটি বেমালুম ভুলে গেলেন বা চেপে গেলেন ঃ ''দুর্ভাগ্যবশত প্রতিটি লোকই তার কালের সৃষ্টি এবং এটাই যদি কাউকে আক্রমণ না করার পক্ষে যথেষ্ট হয়ে থাকে তবে তো সকল বিরোধ, সকল সংগ্রামেরই অবসান ঘটে যায়''। এঁদেরই নিরলস চেষ্টায় এই অবক্ষয়বাদীরা কমিউনিস্ট পার্টির সহযাত্রী আসনে সসম্মানে প্রতিষ্ঠিত হলেন। এমনকি এও দেখা গেল, যে খ্যাতনামা বুদ্ধিজীবীটি মাত্র কয়েকদিন পূর্বে সংস্কৃতির কণ্ঠরোধে নাৎসী জার্মানী ও সোস্যালিস্ট রাশিয়াকে সমপর্যায়ে ফেলে প্রকাশ্যে স্বনামে প্রবন্ধ ছাপিয়েছেন, অনায়াসেই তাঁকে পার্টির সভ্যপদ দেওয়া হল এবং কিছুদিন পরে সাংস্কৃতিক নেতার আসনেও উন্নীত করা হল। দলপুষ্টির অত্যুৎসাহে ভুলে যাওয়া হল লিউ শাউ চি-র সেই সতর্কবাণী যে, বুর্জোয়া পরিবেশ থেকে যখন কেউ পার্টিতে আসে তখন তাকে দুহাত বাড়িয়ে আলিঙ্গন করতে হবে বটে, কিন্তু তার আগে তাকে ভালো করে স্নান করিয়ে নিতে হবে। নতুবা তার গায়ে বুর্জোয়া কাদা থেকে যাবেই, উপরন্তু পার্টির গায়েও সেই কাদা লাগবে।

দলপুষ্টির অত্যুগ্র আগ্রহে ধোলাই না করে আলিঙ্গন করার নীতির বিষময় ফল ফলতে দেরী হল না। অচিরে দেখা গেল কমিউনিস্ট লেখকরা বাংলাদেশের কমিউনিস্ট সাহিত্যের পূর্বসূরী হিসাবে কল্লোল, কালিকলম গোষ্ঠীর নাম করছেন, নিলর্জ্জের মতো বলছেন তাদের ঐতিহ্যেরই উত্তরসাধক নাকি কমিউনিস্ট পার্টি। তাঁরা ভুলে গেলেন বা বেমালুম চেপে গেলেন যে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর থেকেই 'লাঙ্গল' 'ধুমকেতু' প্রভৃতি কাগজ মারফত মুজাফফর আহম্মদ ও নজরুল ইসলামের নেতৃত্বে একটা শক্তিশালী বৈপ্লবিক সাহিত্য আন্দোলন পুলিশী সন্ত্রাস ও পীড়ন উপেক্ষা করে প্রবাহিত হয়েছিল, যে আন্দোলন কমিউনিস্ট পার্টির গড়ার কাজে বিশেষ সহায়ক হয়েছিল। নজরুলের বিপ্লবীকাব্য এ আন্দোলনের অবদান; এ আন্দোলনই সর্বপ্রথম গোর্কির 'মা' উপন্যাসের সাথে বাঙ্গালী পাঠকের পরিচয় ঘটায়। এ আন্দোলনের বিচিত্র ইতিহাস বুর্জোয়া পাণ্ডিত্যের স্ট্রীমরোলারের তলায় চাপা পড়ে গেছে এবং দুঃখের বিষয় কোনও মার্কসবাদী গবেষক তাকে এযাবৎ উদ্ধারের চেষ্টা করেননি। সমাজতন্ত্রবাদীর এই প্রত্যক্ষ ঐতিহ্যের আগেও সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সামন্তবাদ বিরোধী যে অপ্রত্যক্ষ ঐতিহ্য মাইকেল থেকে রবীন্দ্রনাথ, এমনকি সত্যেন দত্ত, যতীন সেনগুপ্তের রচনাবলীর বিপুল ও বলিষ্ঠ গণতান্ত্রিক অংশের মধ্যে নিহিত রয়েছে সেকথা তো ছেড়েই দিলাম। মুষ্টিমেয় অবক্ষয়ের অজীর্ণের উদ্‌গারকে যারা বাংলাদেশের শ্রমিকশ্রেণীর বিরাট সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সম্পদের স্থলাভিষিক্ত করতে চেয়েছে তারা জ্ঞাতসারে হোক বা অজ্ঞাতসারে হোক বিপ্লবী আন্দোলনের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছে।

'জনযুদ্ধে'র আমলে পার্টির সুদৃঢ় শ্রমিক আন্তর্জাতিকতা ও বিশ্ব কমিউনিস্ট ঐক্যের প্রভাবে বুর্জোয়া পরিবেশ থেকে বহু লেখক ও শিল্পী পার্টির কাছে আসেন। কিন্তু পার্টি নেতৃত্বের চিন্তায় চেতনায় তখন শোধনবাদ প্রবেশ করেছে। ফলে সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে মার্কসবাদী-লেনিনবাদী চিন্তাধারা প্রতিষ্ঠার ওপর গুরুত্ব না দিয়ে তার অনুষঙ্গের পরিবর্তে বিকল্প হিসাবে ফ্রন্ট গঠন ও দলপুষ্টির দিকে সর্বশক্তি নিয়োগ করেন। ফল হয় মারাত্মক। এই ছিদ্রপথে পার্টির মধ্যে অবক্ষয়ী বুর্জোয়া এবং জাতীয়তাবাদী চিন্তাধারার শনি প্রবেশ করতে থাকে। পার্টি সাহিত্যে শ্রেণী উঠে গিয়ে সেখানে আসে জাতীয় জনগণ। শ্রেণীসংগ্রাম, শ্রেণীসংঘর্ষ এবং তারই অগ্নিগর্ভ থেকে উদ্ভুত 'পজিটিভ' চরিত্রের কোনও কিছুইর সন্ধান পাওয়া যায় না পার্টি সাহিত্যে। নিপীড়িতের প্রতি একটা ভাবালু আবেগ এবং সাম্প্রদায়িক হানাহানির ক্ষেত্রে একটা শ্রেণীসম্পর্কহীন উদারনৈতিক শান্তির বেদানার্ত স্বস্তিবাচন ছাড়া আর কিছুরই সন্ধান পাওয়া যায়নি পার্টি সাহিত্যে। সুকান্ত ভট্টাচার্যের কাব্যে শ্রেণীসংগ্রামের ও জনগণের বৈপ্লবিক মেজাজের আবেগ পাওয়া যায়। তার কারণ সম্ভবত তখনকার দুনিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলের নিপীড়িত জনগণের সশস্ত্র অভ্যুত্থানের সংবাদের একটা আশ্চর্য প্রতিক্রিয়া ঘটেছিল এই তরুণ কবির মানসলোকে যার ফলে সে পার্টির সাংস্কৃতিক দৃষ্টির শোধনবাদী উদারনীতির ঊর্ধ্বে উঠতে পেরেছিল। (ঠিক এর আগের যুগে ঢাকার তরুণ লেখক সোমেন চন্দের ক্ষণস্থায়ী জীবনেও তদানীন্তন অবক্ষয়ী চিন্তাধারার প্রাবল্য সত্ত্বেও প্রকৃত মার্কসবাদী-লেনিনবাদী শিল্পীসত্তার আবির্ভাব ঘটেছে। মাত্র একুশ বছর বয়সে রাজনৈতিক গুপ্ত ঘাতকের হাতে তিনি নিহত হন)। পার্টির পাশে ও মধ্যে আসা আরও বহু শক্তিমান শিল্পী বহু গুরুত্বপূর্ণ স্থায়ী অবদান রেখে গেছেন সন্দেহ নাই ঃ বহু প্রত্যাশা করে তাঁরা এসেছিলেন। কিন্তু মার্কসবাদ-লেনিনবাদের আলোকবর্তিকার অভাবে তাঁরা বেশি দূর অগ্রসর হতে পারেননি। চিরায়ত মার্কসবাদী সাহিত্যের প্রতি অবজ্ঞাশীল তখনকার যোশী নেতৃত্ব তাঁদের জাতীয়তাবাদের ঊর্ধ্বে প্রলেতারীয় দৃষ্টিভঙ্গীতে দীক্ষিত হতে সাহায্য করেনি। (আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

শারদীয় দেশ-হিতৈষী-১৩৭১/১৯৬৫

আন্তর্জাতিক

ব্র্যাডলে ম্যানিং—সাম্রাজ্যবাদের মুখোশ খুলে দেওয়া এক স্পর্ধিত নায়ক

যাঁর বিবেকের তাড়না ছাড়া ইরাক ও আফগানিস্তানে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের কুকীর্তিগুলো পৃথিবীর মানুষের কাছে অজানা থাকত, যাঁরা সহায়তা ছাড়া জুলিয়ান অ্যাসাঞ্জ-এর তথ্যভাণ্ডার অত সমৃদ্ধ হত না ও তাঁর সৃষ্ট আলোড়নও অত প্রবল হত না, সাম্রাজ্যবাদের সন্ত্রাস-বিরোধী যুদ্ধের আসল রূপকে যিনি দুনিয়ার সামনে নগ্ন করে দিয়েছেন, সেই প্রাক্তন মার্কিন সেনা ব্র্যাডলে ম্যানিং-এর সম্প্রতি সামরিক আদালতে বিচার শেষ হয়ে শাস্তি হয়েছে ১৩৬ বছরের কারাদণ্ড। আমরা কি করে ভুলে যেতে পারি ''আনুষঙ্গিক ক্ষয়ক্ষতি'' নামে সেই ভিডিও-কে, যাতে দেখা যাচ্ছে হাতে বন্দুক নিয়ে মার্কিন সেনা অ্যাপাচে হেলিকপ্টার থেকে মেতে উঠেছে রক্ত লালসায়, হত্যা করছে নিরীহ-নিরপরাধ ইরাকিদের এবং রয়টারের সাংবাদিকদের! 'গণতন্ত্র' ও 'মুক্তি' প্রদান-এর নামে নির্ভেজাল যুদ্ধাপরাধের ২০০৭ সালের এই দলিলকে দুনিয়ার মানুষ প্রত্যক্ষ করেছিল ম্যানিং-এর কল্যাণে। উইকিলিকসকে গোপনীয় সামরিক নথি সরবরাহ করার জন্যে (সংখ্যাটা প্রায় ৭ লক্ষ বলে জানা যায়) ম্যানিংকে ইরাক থেকে গ্রেপ্তার করা হয় ২০১০-এর ২৯ মে। এরপর ওবামা প্রশাসন তাঁর সঙ্গে অত্যন্ত নিষ্ঠুর আচরণ করে। দোষী সাব্যস্ত হওয়ার আগেই তিন বছরেরও বেশি সময় জেলে আটকে রেখে তাঁকে নির্মম শাস্তি দেওয়া হয়। তাঁকে ভার্জিনিয়ার কোয়ান্টিকোর ছোট একটা সেলে বন্দী করে রাখা হয়, তাঁর জন্য কোন বালিশ-তোষক বরাদ্দ ছিল না। সারা রাত তাঁকে প্রায় নগ্ন করে রাখা হত, আর ভোর পাঁচটায় উঠিয়ে দেওয়া হত দৈহিক পরীক্ষার জন্যে। মানসিক অত্যাচার চালাতে তাঁর জন্য নির্দিষ্ট প্রহরী পাঁচ মিনিট অন্তরই জিগ্যেস করে উঠত—ম্যানিং, তুমি ঠিক আছ তো! কাগজ পড়া বা টিভি দেখার সময়টুকুই শুধু তাঁকে চশমা দেওয়া হত, বাকি সময়ে চশমা কেড়ে নিয়ে প্রায় অন্ধ অবস্থায় থাকতে বাধ্য করা হত। তাঁর সঙ্গে কি ধরনের ব্যবহার করা হচ্ছে তা পরখ করার জন্য রাষ্ট্রপুঞ্জের তদন্তকারীও বলেছেন যে, কর্তৃপক্ষ তাঁর সঙ্গে 'নিষ্ঠুর ও পাশবিক' আচরণ করেছেন। ওরা ভেবেছিল ম্যানিং-এর ওপর এই নির্যাতন চালিয়ে তাঁর আদর্শ ও মানসিক দৃঢ়তাকে ভেঙ্গে দিয়ে তাঁকে ওদের পায়ে নত করাতে পারবে। কিন্তু মার্কিনের যে বিদেশ নীতিকে তিনি কাঠগড়ায় দাঁড় করাতে চেয়েছিলেন, সাম্রাজ্যবাদ অনুসৃত পথের অসারতা ও নির্মমতাকে জনসমক্ষে প্রকাশ করার যে প্রয়োজনীয়তাকে তিনি অতীব গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করেছিলেন, বিচারের রায় প্রকাশের সময় পর্যন্ত সেই বিশ্বাসের প্রতি তিনি অটল ছিলেন।

মার্কিন সরকার তাঁর বিরুদ্ধে ২২টা অভিযোগ এনেছিল, যার মধ্যে শত্রুকে সাহায্য করার অভিযোগও ছিল। ম্যানিং শত্রুকে সাহায্য করার অভিযোগ দৃঢ়ভাবে অস্বীকার করেন এবং সেই অভিযোগ প্রতিষ্ঠিত না হওয়ায় তাঁকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়নি। তবে মার্কিন কূটনীতিকদের পাঠানো কেবলগুলো (তার বার্তা) ও সেনাদের গোপন নথি ইউকিলিকসকে সরবরাহ করার অভিযোগ তিনি স্পর্ধার সঙ্গেই স্বীকার করেন। সামরিক আদালতে বিচার চলার সময় এ বছরের ১ মার্চ ম্যানিং আদালতের কাছে ৩৫ পৃষ্ঠার এক বিবৃতি পাঠ করেন। সেই বিবৃতিতে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে তিনি বলেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের গোপনীয় সামরিক ও সরকারি নথি ফাঁস করার তাঁর উদ্দেশ্য ছিল ''সাধারণভাবে সামরিক বাহিনী ও বিদেশ নীতি নিয়ে দেশে এক বিতর্ক সৃষ্টি করা'' যাতে করে ''সমাজ পাল্টা সন্ত্রাসবাদ ও পাল্টা বিদ্রোহকে উসকিয়ে তোলার প্রয়োজনীয়তা ও এমনকি আকাঙ্খা সম্পর্কে নতুন করে ভাবতে পারে, যে অভিযানগুলো ঐ পরিমণ্ডলে বাস করা জনগণের ওপর তার প্রতিক্রিয়াকে তুচ্ছ করে।'' তিনি আরও বলেন, ''আমি যতই (তারবার্তাগুলোকে) পড়ছিলাম ততই এই বিষয়টা আমাকে আলোড়িত করছিল যে, আমরা কিভাবে অন্যান্য দেশ ও সংগঠনের সঙ্গে ব্যবহার করি। আমি এটাও ভাবতে শুরু করলাম যে, পিছনের দরজা দিয়ে চালানো নথিবদ্ধ চুক্তি এবং স্পষ্টতই অপরাধমূলক কার্যকলাপগুলো মুক্ত বিশ্বের যে কার্যত নেতা তার বৈশিষ্ট্য হতে পারে না। ... যতই আমি তারবার্তাগুলোকে পড়তে লাগলাম ততই আমি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছালাম যে এগুলো এমন ধরনের তথ্য যেগুলো সর্বসমক্ষে আসা দরকার।'' ''আনুষঙ্গিক ক্ষয়ক্ষতি''র যে ভিডিও-র কথা উপরে বলা হয়েছে, সে সম্পর্কে ম্যানিং-এর বক্তব্যও উল্লেখের দাবি রাখে ঃ ''আমার কাছে এই ভিডিও-র সবচেয়ে ভয়াবহ যে দিকটা ধরা পড়েছিল তা হল, (মার্কিন সেনারা) কি অবলীলায় মধুর রক্তলালসায় মেতে উঠেছিল'' এই বক্তব্য তো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জনগণের কাছে, দুনিয়ার মানুষের কাছে সাম্রাজ্যবাদের স্বরূপের প্রামাণ্য দলিল, সাম্রাজ্যবাদ এটাকে হজম করবে কি করে?

তাঁর ফাঁস করা তথ্যগুলোকে ম্যানিং বলেছেন ''আমাদের সময়ের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কিছু নথি।'' এই নথিগুলোর তাৎপর্য যে অসীম তা নিয়ে বিতর্কের কোন অবকাশ থাকতে পারে না। ঐ নথিগুলোর তাৎপর্য সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে ভাষ্যকার ক্রিস হেজেস বলেছেন, ''পেন্টাগনের নথি (ভিয়েতনাম যুদ্ধের সময়কার—লেখক) ফাঁস হওয়ার পর থেকে সাম্রাজ্যবাদী শক্তির গোপন কাজকারবার সম্পর্কে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জানলাটা ম্যানিং জনগণের কাছে খুলে দিয়েছেন। নিয়মিতভাবে নিপীড়ন চালানো, নিরাপরাধ ইরাকিদের আটক করা, আমাদের গোপন বন্দী শিবিরগুলোর নির্মম পরিমণ্ডল, পররাষ্ট্র দপ্তরের অফিসারদের রাষ্ট্রপুঞ্জে চর হিসেবে কাজে লাগানো, কর্পোরেশনগুলোর সঙ্গে যোগসাজশ চালিয়ে হাইতির মত উন্নয়নশীল দেশগুলোতে মজুরিকে কমিয়ে রাখা এবং আফগানিস্তানে একটি বাড়িতে ক্ষেপণাস্ত্র হানায় সাতজন শিশুর নিহত হওয়ার মত সুনির্দিষ্ট যুদ্ধাপরাধ—ম্যানিং না জানালে এগুলো গোপনই থেকে যেত।'' ম্যানিং-এর ফাঁস করা নথি সাম্রাজ্যবাদকে নগ্ন করে দিয়েছে, 'মুক্তি' ও 'গণতন্ত্র'র বুলির আড়ালে তার ক্রুর অভিসন্ধি ও পাশবিকতাকে উন্মোচিত করেছে, গণতন্ত্রের প্রতি তার তীব্র ঘৃণা ও মানবাধিকারকে পদদলিত করে চলার তার মজ্জাগত বৈশিষ্ট্যকে প্রকট করেছে—এই সমস্ত নথি শুধু আজকের জন্যই গুরুত্বপূর্ণ নয়, ইতিহাসেও তা স্থায়ী গুরুত্বপূর্ণ হয়েই স্থান পাবে।

যে আইনকে আশ্রয় করে ম্যানিংকে শাস্তি দেওয়া হয়েছে তা হল ১৯১৭ সালে তৈরি এসপিওনেজ অ্যাক্ট বা গুপ্তচরবৃত্তি আইন, যে আইন অনুযায়ী গোপনীয় সরকারি নথি পাচার করা অপরাধ। ওবামার আগে এই আইনের প্রয়োগ হয়েছে সাকুল্যে তিনবার, আর ওবামা জমানায় এই আইনের প্রয়োগ ইতিমধ্যেই হয়ে গেল সাতবার। যাঁরা এই আইনে শাস্তি পেয়েছেন তাঁরা সবাই হুইসেল ব্লোয়ার বা সরকারি অপরাধ ও অকর্মন্যতার ফাঁসকারি। স্পষ্টতই, সাম্রাজ্যবাদ যতই বেশি বেশি সন্ত্রাস ও হিংসাপ্রবণ হয়ে উঠছে, ততই দেশের ভেতর থেকেই ব্যবস্থা বিরোধী শক্তি মাথাচাড়া দিচ্ছে। আর তাই ব্র্যাডলে ম্যানিং ওবামার কাছে ছিলেন ''রাষ্ট্রের শত্রু''। ম্যানিং-এর বিচারের সপক্ষে যুক্তি দিতে গিয়ে ওবামা বলেছেন, ''আমরা হলাম আইনমানা এক জাতি। আইন কিভাবে কাজ করবে সেটা ঠিক করার অনুমতি কোন ব্যক্তি বিশেষকে আমরা দিই না। ম্যানিং আইন ভেঙেছেন।'' বিচার শেষ হওয়ার আগেই ম্যানিংকে দোষী সাব্যস্ত করে ওবামা বুঝিয়ে দিয়েছিলেন যে, ম্যানিং-এর বিচারের পরিণতি কি হতে চলেছে। ম্যানিং ঠিক এই আইনের নামেই চলা অরাজকতা, মানবতার বিরুদ্ধে সংঘটিত সাম্রাজ্যবাদের লাগাতার অপরাধের গোপন কক্ষের দরজাকে দুহাট করে খুলে দিয়েছেন। ম্যানিংকে শাস্তি দিয়ে মার্কিন রাষ্ট্র ও ওবামা প্রশাসন সত্য উদঘাটনকারী সাংবাদিক ও ব্যক্তিবর্গকে এই বার্তাই দিতে চাইছে যে—ম্যানিং-এর পথে যেও না, মার্কিন সরকার অপদস্থ হয় এমন কোন কাজ করলে তোমাদেরও একই দশা হবে, তোমরাও রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগে অভিযুক্ত হবে। শাসকের হুমকি কিছু মানুষকে দমিয়ে দিতে পারলেও সবাইকে পারে না। ম্যানিং-এর সমর্থনে বহু মানুষ প্রতিবাদ জানিয়েছেন, তাঁর মুক্তির দাবিতে সোচ্চার হয়েছেন। তিন নোবেল শান্তি পুরস্কার প্রাপক আর্চ বিশপ ডেসমণ্ড টুটু, ম্যারিয়ড ম্যাগুরে ও এডোল্টো পেরেজ একুইভেল তাঁদের এক বিবৃতিতে বলেছেন, ''সরকারি কর্তৃপক্ষ যেমন দাবি করছেন, ব্র্যাডলে ম্যানিং যদি ঐ নথিগুলোকে ফাঁস করে থাকেন তবে সরকারে দায়বদ্ধতা আনা, আলোকিত গণতন্ত্র ও শান্তির জন্য তাঁর প্রচেষ্টাকে আমাদের কৃতজ্ঞতা জানানো উচিত।'' ভিয়েতনাম যুদ্ধের সময় যিনি গোপনীয় পেন্টাগন নথি ফাঁস করেছিলেন সেই ড্যানিয়েল এলসবার্গও বলেছেন, ''সত্য কথনের ভবিষ্যৎ বিপন্ন এবং এক যুবকের স্বার্থশূন্য, বীরত্বপূর্ণ দেশপ্রেমিক কর্মকাণ্ড আমাদের সমর্থন দাবি করে।'' জুলিয়ান অ্যাসাঞ্জ, ব্র্যাডলে ম্যানিং ও এডওয়ার্ড স্নোডেন—এই তিনজনই হলেন হুইসিল ব্লোয়ার এবং মার্কিন প্রশাসনের নির্মম, দমনমূলক, কুচক্রী চরিত্রকে উন্মোচিত করে দিয়ে পৃথিবীর সবথেকে শক্তিশালী রাষ্ট্রটির রোষানল আকর্ষণ করেছেন। এই মুহূর্তে অ্যাসাঞ্জ লণ্ডনে ইকুয়েডরের দূতাবাসে এবং স্নোডেন রাশিয়ায় নিরাপদ আশ্রয়ে থাকলেও আজীবন জেলবন্দীত্বই ম্যানিং-এর নিয়তি হয়ে উঠল। ম্যানিং যখন নথিগুলোকে ফাঁস করেন তখন তাঁর বয়স ছিল ২২, আর এখন ২৬ বছর। অত্যন্ত অল্প বয়সে গোটা জীবনটাকেই বাজি রেখেছিলেন এক সুন্দর পৃথিবীর স্বপ্নের কাছে। ওবামা প্রশাসনের চোখে তিনি ''নিজেকে জাহির করা বিশ্বাসঘাতক'' হলেও বিশ্বের আপামর গণতন্ত্রপ্রেমী, যুদ্ধবিরোধী জনগণের হৃদয়ে তিনি মানবতার একনিষ্ঠ বন্ধু, শান্তির সৈনিক, জনগণের নায়ক হয়েই থাকবেন। মার্কিন রাষ্ট্র তার হাজারো প্রচেষ্টা সত্ত্বেও ইতিহাসের পাতা থেকে তাঁকে মুছে ফেলতে পারবে না, ইতিহাসে তিনি থেকে যাবেন প্রবল শক্তির চোখ রাঙানিকে উপেক্ষা করে সত্য উদঘাটনের জীবন্ত প্রেরণা হিসেবে।

- জয়দীপ মিত্র

সি পি আই (এম এল) কেন্দ্রীয় কমিটি প্রকাশিত
ইংরাজী সাপ্তাহিক ''আপডেট''
গ্রাহক মূল্য ঃ ৫০ টাকা

তামিলনাড়ুতে নারী শ্রমিকদের কনভেনশন

এ আই সি সি টি ইউ তামিলনাড়ুর তিরুনেলভেলিতে গত ৩০ জুন রাজ্য স্তরে নারী শ্রমিকদের একটি কনভেনশন সংগঠিত করে। শুরুতে, যারা সম্প্রতি উত্তরাখণ্ডে মানুষের সৃষ্ট ভয়াবহ বিধ্বংসী বিপর্যয় থেকে জনগণের জীবন ও সম্পত্তি উদ্ধার করতে গিয়ে নিজেদের জীবন দিয়েছেন সেই সমস্ত সেনাদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়।

কনভেনশন যে সমস্ত দাবি তুলে ধরেছে তা হল ঃ

(১) তামিলনাড়ুর সরকারি ও বেসরকারি ক্ষেত্রে এবং সরকারি দপ্তরগুলোতে স্থায়ী ও অস্থায়ী, সংগঠিত ও অসংগঠিত নারী শ্রমিকদের সংখ্যাগত বিন্যাস, (২) রাজ্য সরকারকে এল এ বিলে ৪৭/২০০৮-এর ওপর রাষ্ট্রপতির সম্মতির জন্য জরুরী প্রয়াস শুরু করতে হবে যা কীনা সুমঙ্গলি প্রকল্পে নারী শ্রমিকদের অধিকারকে অন্তত পক্ষে কিছুটা সুরক্ষিত করবে, (৩) রাজ্যে কর্মক্ষেত্রে নারীদের ওপর যৌন হয়রানি (প্রতিরোধ, নিবারণ ও প্রতিবিধান) আইন ২০১৩ অবিলম্বে লাগু করতে হবে, (৪) নারী শ্রমিকদের সমকাজে সমমজুরি দিতে হবে, (৫) নারী শ্রমিকদের জন্য অর্থবহ সামাজিক নিরাপত্তার বিধিব্যবস্থা থাকতে হবে, (৬) রাজ্যের পোশাক শিল্পের নারী শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরির নতুন পুনর্বিন্যাস করতে হবে (এটি সর্বশেষ করা হয়েছিল প্রায় দশবছর আগে ২০০৪ সালে), (৭) গৃহ শ্রমজীবীদের জন্যও ন্যূনতম মজুরি স্থির করা প্রয়োজন।

উপরোক্ত কনভেনশন অনুষ্ঠিত হল এমন এক পটভূমিতে যখন তামিলনাড়ু রাজ্যের এই জেলা শ্রম কমিশনারের অফিসের নথিপত্রে বিড়ি শিল্পের লক্ষ লক্ষ নারী শ্রমিকদের কোন অস্তিত্ব নেই, ফলে ঐ সমস্ত নারী শ্রমিকদের বিধিবদ্ধ অধিকারগুলো অস্বীকৃত হয়ে চলেছে, পি এফ অফিসে পড়ে রয়েছে প্রায় ৭৩ কোটি টাকা যার দাবিদারের কোন হদিশ মিলছে না। সুপ্রীম কোর্ট যখন তামিলনাড়ু সরকারকে নির্মাণ শ্রমিকদের সুযোগ-সুবিধা আরও বাড়ানোর জন্য নির্মাণক্ষেত্র থেকে সেস সংগ্রহের মাত্রাকে বর্তমানে ০.৩ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ১ শতাংশ আদায় করতে বলে, তখন তামিলনাড়ু সরকার প্রত্যুত্তরে এটা বলে যে, নির্মাণ শ্রমিকদের কল্যাণ তহবিলে পর্যাপ্ত টাকা রয়েছে, তাদেরকে যথেষ্ট আর্থিক সহায়তা দিয়েও যেহেতু কল্যাণ তহবিলে পর্যাপ্ত অর্থ থাকছে তাই নির্মাণক্ষেত্র থেকে সেস আদায়ের মাত্রা বৃদ্ধির প্রশ্ন আসে না। কিন্তু তামিলনাড়ুর প্রকৃত অবস্থা হল, সমস্ত নির্মাণ শ্রমিকরা, যাদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ নারী শ্রমিক, এখনও কল্যাণ তহবিলে নথিভুক্ত নন, এমনকি যাদের নথিভুক্ত করা হয়েছে তারা কল্যাণকর সুবিধাগুলো ঠিক পাচ্ছেন না।

তিরুনেলভেলি কনভেনশনে বক্তাদের মধ্যে ছিলেন এ আই টি ইউ সি-র সর্বভারতীয় সহ-সভাপতি বাহিদা নিজান, সিটুর সর্বভারতীয় সহ-সভাপতি মালতী চিত্তিবাবু, উওমেন ওয়ার্কার্স ট্রেড ইউনিয়নের সভাপতি সুজাতা মোদী।

কনভেনশনে সভাপতিত্ব করেন এ আই সি সি টি ইউ-র তামিলনাড়ু রাজ্য কাউন্সিল সদস্য কমরেড আনু বুসেলভি। প্রস্তাবগুচ্ছ পেশ করেন

আটের পাতায় দেখুন

ভারতীয় ক্রিকেটের রাহু মুক্তি কে ঘটাবে?

ভারতীয় ক্রিকেটের রাহু মুক্তি কি সত্যিই ঘটবে! সাম্প্রতিক ভারতীয় ক্রিকেট কেলেঙ্কারি এখন সংবাদের শিরোনামে। এই কেলেঙ্কারিতে বর্তমান বোর্ড সভাপতি সরাসরি যুক্ত। এককালে ভদ্দরলোকের খেলা ক্রিকেট এখন অপরাধী চক্রব্যূহে আবদ্ধ। ন্যায়-নীতি-শৃঙ্খলাপরায়ণতা যে খেলার অঙ্গভূষণ ছিল তা এখন বিশৃঙ্খলা ও অ-নীতিনিষ্ঠতার আখড়াতে পরিণত হয়েছে। বিশ্ব ক্রিকেটে যদি অপরাধচক্র সক্রিয় থাকে তার থেকে ভারতবর্ষ কি ব্যতিক্রমী হতে পারে? হয়ও নি। এই উপমহাদেশেই ইদানিং ক্রিকেটে অপরাধীচক্র দারুণভাবে সক্রিয়। পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কা ও ভারতবর্ষ কেউ এর থেকে মুক্ত নয়। ক্রিকেটে অপরাধীচক্র-কর্পোরেট পুঁজি এখন হাত ধরাধরি করে চলছে!

ভারতবর্ষে গত শতাব্দীর শেষ লগ্নে ভারতীয় ক্রিকেট বেটিংচক্রে জেরবার হয়ে ওঠে। সে সময় ভারতবর্ষের ক্রিকেটের আইকন শচীন তেণ্ডুলকর দলকে নেতৃত্ব দিতে অস্বীকার করায় বাঙালিদের উঠতি হার্ট-থ্রব সৌরভ গাঙ্গুলিকে নেতা হিসাবে তৎকালীন বোর্ড সভাপতি জগমোহন ডালমিয়া চয়ন করেন। এবং নেতা সৌরভ ভারতীয় ক্রিকেটের হৃত গৌরব ফিরিয়ে আনেন এবং ক্রিকেটকে কিছুটা নিষ্কলঙ্ক করে তোলেন। এরপরে গঙ্গা-যমুনা দিয়ে অনেক জল বয়ে গিয়েছে। ভারতীয় ক্রিকেট সৌরভের হাতে দল হিসাবে গড়ে ওঠার পর ধোনী নেতা হন। এবং ধোনীর নেতৃত্বে ভারতীয় ক্রিকেট খ্যাতির সর্বোচ্চ শিখরে পৌঁছে বিশ্ব ক্রিকেটকে শাসন করেছে। এখনও তা অব্যাহত আছে। এরফলে ক্রিকেটের জনপ্রিয়তা তুঙ্গে ওঠে। ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের ক্ষমতাদ্বন্দ্বে ও গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে কোণঠাসা হয়ে ডালমিয়া অপসারিত হন। ডালমিয়া যুগের অবসান ঘটে। এরপর শারদ পাওয়ার ললিত মোদী বিন্দ্রা ইত্যাদি হয়ে শ্রীনিবাসন-রাজীব শুক্লা-অরুণ জেটলি ইত্যাদিদের যুগ চলতে থাকে। ললিত মোদীরা ক্রিকেটের বাজারকে প্রসারিত করার জন্য ভারতবর্ষ জুড়ে আই পি এল (টি-২০ ক্রিকেট চালু করে। ক্রিকেটের এই ইণ্ডিয়ান প্রিমিয়ার লীগ (আই পি এল) চালুর মাধ্যমে ঢুকে পড়ে কর্পোরেট সংস্কৃতি।

এই সংস্কৃতিতেই বিনিয়োগ হতে থাকে কোটি কোটি টাকা। প্রিমিয়ার লীগে অংশগ্রহণকারী ফ্রাঞ্চাইজিগুলোর মাধ্যমে। এবং এই ফ্রাঞ্চাইজিগুলোর মালিকরা অপরাধী চাঁইদের সঙ্গে যোগসাজশ ঘটিয়ে ক্রিকেটকে জুয়ার আখড়াতে পরিণত করে। আই পি এলের প্রথম দুটি সংস্করণে এই অপরাধী কর্পোরেট ফ্রাঞ্চাইজি চক্রের উদ্‌ঘাটন সেভাবে না ঘটলেও তৃতীয় সংস্করণ থেকে তার প্রকোপ বুঝতে পারা যায়। চক্র সম্পূর্ণ হয় ষষ্ঠ সংস্করণে। যেখানে খোদ বোর্ড সভাপতি শ্রী নিবাসনের চেন্নাই সুপার কিংস (জামাতা সহ রাজস্থান রয়াল চ্যালেঞ্জারের ক্রিকেটার শ্রীসান্থ সহ আরও কয়েকজন)-এর মালিকের বিরুদ্ধে ম্যাচ ফিক্সিং-এর অভিযোগ প্রমাণিত হয়। অভিযুক্ত ক্রিকেটাররা ধরা পড়ে এবং তাদের জেল হেফাজতও হয়। শেষ পর্যন্ত শ্রীনিবাসনকে পদত্যাগ করতে হয় বোর্ড সভাপতি পদ থেকে তাঁর ফ্রাঞ্চাইজির ম্যাচ ফিক্সিং-এ জড়িয়ে থাকার কারণে। অন্তবর্তী বোর্ড সভাপতি হিসাবে ডালমিয়াকে দায়িত্ব দেওয়া হয়। ইতিমধ্যে বোর্ড স্পষ্ট ফিক্সিং কাণ্ডে তদন্ত কমিটি গড়ে শ্রীনিবাসনকে ক্লিনচিট দেওয়ার যে পরিকল্পনা নেয় তা ধাক্কা খায় মুম্বাই হাইকোর্টের রায়ে। এই রায়ে স্পট-ফিক্সিং কাণ্ডে বোর্ড গঠিত তদন্ত কমিটিকে বেআইনি ও অসাংবিধানিক বলা হয়। কোর্টের এই রায়কে অমান্য করে বোর্ড পুনরায় মিটিং করে শ্রীনিবাসনকে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত গণমাধ্যমের চাপে বোর্ডের সদস্যদের গোষ্ঠী বিভাজনের জেরে শ্রীনিবাসনকে বোর্ড সভাপতির দায়িত্বে আপাতত ফিরিয়ে আনা হবে না তাই স্থির হয়। মিটিংও ভেস্তে যায়। বোর্ড মুম্বাই হাইকোর্টের রায়কে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে সুপ্রীম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছে। সুপ্রীম কোর্টে বোর্ড যে আবেদন করেছে তাতে তারা বলেছে, দুই সদস্যের তদন্ত কমিটি তারা গড়েছে তাদের সংবিধান মেনেই। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন অব বিহার বোর্ডের এই তদন্ত কমিটি গড়ার বিরুদ্ধে মুম্বাই হাইকোর্টে মামলা করেছিল। মুম্বাই হাইকোর্ট ঐ তদন্ত কমিটিকে অসাংবিধানিক ও বে-আইনি বলে রায় দিয়েছে। সম্প্রতি মাদ্রাজ হাইকোর্টও বোর্ডের বিরুদ্ধেই রায়ে জানিয়েছে ক্রিকেট এভাবে চললে ক্রিকেট সমর্থকদের বঞ্চিতই করা হবে। ভারতীয় ক্রিকেটের আরেক আইকন রাহুল দ্রাবিড় সম্প্রতি মুখ খুলেছেন উদ্ভূত পরিস্থিতি নিয়ে, তিনি মাঠের বাইরে ভারতীয় ক্রিকেট নিয়ে সম্প্রতি যা ঘটে চলেছে তা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। তিনি জানিয়েছেন ক্রিকেটের বিশ্বাসযোগ্যতা ফেরানো অত্যন্ত জরুরী, না হলে ক্রিকেটররা সমর্থকদের শ্রদ্ধা হারাবেন।

রাহুল তবুও মুখ খুলেছেন। কিন্তু অন্যান্য আইকনরা যদি মুখ না খোলেন তাহলে বোর্ডের স্বেচ্ছাচারিতা বাড়বে এবং ক্রিকেটও অলিখিত জুয়াতে পরিণত হবে। ক্রিকেটে অপরাধ প্রবণতাও ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাবে। বোর্ডের উচিত আইন মেনে কাজ করা। এবং ক্রিকেটের স্বচ্ছ ভাবমূর্তি ফিরিয়ে আনা।

- নিত্যানন্দ ঘোষ

স্মরণ সভা

হাওড়ার আড়ুপাড়া-কামারডাঙ্গা সি পি আই (এম এল) লোকাল কমিটির সদস্য সদ্য প্রয়াত কমরেড সমীর হোড়ের স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয় ২৭ জুলাই হাটপুকুর সুভাষ সংঘ ক্লাব গৃহে। তিনি কিছুদিন যাবৎ প্যাংক্রিয়াস এবং ডায়াবিটিস রোগাক্রান্ত ছিলেন। গত ৪ জুলাই শেঠ সুখলাল কারনানী হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে বয়স হয়েছিল ৬৩ বছর। সত্তর সালের উত্তাল দিনে সমাজ বদলের আহ্বানে সাড়া দিয়ে পার্টির সঙ্গে যুক্ত হন। পুলিশী অত্যাচার এড়াতে দীর্ঘদিন বাড়ির বাইরে, এমনকি গাছের ডালে গামছা বেঁধে ঝুলে রাত কাটিয়েছেন। তিনি ঢালাই শিল্পের সঙ্গে যুক্ত থাকায় ঐ শিল্পের শ্রমিকদের নিয়ে সংগঠন গড়ার প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন। তিনি ছিলেন পার্টির একনিষ্ঠ কর্মী।

তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে এক মিনিট নীরবতা পালনের মধ্যে দিয়ে সভার কাজ শুরু হয়। সভায় স্মৃতিচারণা করেন পার্টির কমরেড, তাঁর বন্ধু, শুভানুধ্যায়ীগণ। বিভিন্ন বক্তা স্মৃতিচারণে তাঁর শৈশবের কথা, রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ ও ত্যাগের কথা, বিভিন্ন অজানা তথ্য তুলে ধরেন। তাঁর মৃত্যুতে লোকাল কমিটির যে অপূরণীয় ক্ষতি হল, তা পূরণের জন্য কর্মীদের আরও বেশি সক্রিয়, শৃঙ্খলাপরায়ণ হয়ে পার্টির কাজকে এগিয়ে যাওয়ার মধ্য দিয়ে তাঁর প্রতি প্রকৃত শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের আহ্বানে জানান জেলা সম্পাদক কমরেড দেবব্রত ভক্ত। আন্তর্জাতিক সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে সভার কাজ শেষ হয়। সভা সঞ্চালনা করেন কমরেড জলধর মণ্ডল।

প্রচণ্ড রাগে ফুঁসছে কামদুনি

কামদুনিতে টুম্পা কয়াল ও অন্যদের সাথে প্রগতিশীল মহিলা সমিতির প্রতিনিধিবৃন্দ।

সারা ভারত প্রগতিশীল মহিলা সমিতির এক প্রতিনিধি দল ৬ আগস্ট কামদুনিতে যায়। এতে ছিলেন রাজ্য নেত্রী চৈতালী সেন, অর্চনা ঘটক, কল্যাণী গোস্বামী, শুক্লা সেন, চন্দ্রাস্মিতা চৌধুরী ও অন্য সাথীরা। যেখানে অপরাজিতাকে ধর্ষণ করে খুন করা হয়েছিল সে জায়গাটিও তাঁরা ঘুরে দেখেন। অপরাজিতার বাড়ি গিয়ে তাঁর মা, বাবা, কাকা, কাকিমা ও প্রতিবেশী—সকলের সাথে দীর্ঘ সময় ধরে কথা বলেন। দুমাস হয়ে গেল অপরাধীদের কোন শাস্তি না হওয়ায় প্রশাসনের ওপর যেমন তাঁদের রাগ বাড়ছে, তেমনই হতাশাও মাঝে মাঝে লাগছে। তবে অপরাধীদের কঠোর শাস্তির দাবিতে অনড় সকলে। চোখে জল নিয়ে অপরাজিতার মা বলছিলেন, ''আগুন জ্বলছে বুকে, রাক্ষসদের একটুও মায়া-মমতা হল না? ওদেরও ... যাতে সব মানুষ ওদের মাড়িয়ে যায়''। মৌসুমী, টুম্পা এবং অপরাজিতার দাদা, গ্রামের এক সংগ্রামী যুবক—সকলে একসাথে প্রতিনিধিদের সঙ্গে খোলামেলা কথা বলেন। তাঁরা জানান সি আই ডি তদন্তে তাঁদের আস্থা নেই। বিচার ঠিক মত না হলে তাঁরা অনশন আন্দোলন করবেন। তাঁরা আরও বলেন, কেবল আমাদের গ্রাম নয়, গোটা রাজ্যে মেয়েদের ওপর যে অত্যাচার চলছে তার বিরুদ্ধেও আমরা আন্দোলন করছি। তাঁদের সকলের কথায় এবং শরীরি ভাষায় ফুটে ওঠে অদম্য সেই সংগ্রামী মানসিকতা, যা কামদুনিকে বিখ্যাত করে তুলেছে। ফেরার সময়ে প্রতিনিধি দল যখন সংগ্রামী শ্লোগান তোলেন তাতে তাঁরাও গলা মেলান। হাত নেড়ে বলেন, আবার আসবেন।

মধ্যমগ্রাম পৌরপ্রধানের কাছে মিড ডে মিল কর্মী নিয়োগের দাবিতে ডেপুটেশন

মিড ডে মিল দপ্তর থেকে সরকারি সার্কুলার দেওয়া হয়েছিল প্রায় একবছর আগে। তারপরে আজ পর্যন্ত রন্ধনকর্মী নিয়োগ করা হচ্ছে না কেন তার জবাব এড়িয়ে যাচ্ছেন মধ্যমগ্রাম পৌরপ্রধান। মিড ডে মিল ইউনিয়নের মধ্যমগ্রাম শাখার তরফে বারবার এনিয়ে পৌরপ্রধানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে সময় চাওয়া সত্ত্বেও পৌরপ্রধান পাশ কাটিয়ে যাচ্ছিলেন। তাই চুপচাপ না থেকে ইউনিয়ন কর্মীরা গত ৩১ জুলাই পৌরভবনে গিয়ে পৌরপ্রধানের কাছে কৈফিয়ৎ চাইতে শুরু করেন এবং কবে নিয়োগ করা হবে সরাসরি জানতে চান। আরও ২৪ জন রন্ধন কর্মীর নিয়োগ না হওয়ার ফলে কর্মরত কর্মীদের উপর অমানুষিক পরিশ্রমের বোঝা চাপানো থাকছে। স্বাভাবিকভাবেই ডেপুটেশন চলাকালীন একপ্রস্থ উত্তপ্ত কথাবার্তা বিনিময় হয়। অগত্যা পৌরপ্রধান নির্ধারিত সংখ্যক কর্মী নিয়োগ করার প্রতিশ্রুতি দিলে তবে ডেপুটেশন প্রতিনিধিরা ঘর ছাড়েন। কর্মীরা উপলব্ধি করলেন দাবি আদায়ের প্রশ্নে একরোখা আর একজোট থাকলে অনেককাজই হয়। ডেপুটেশনে নেতৃত্ব দেন মিড ডে মিল ইউনিয়নের মধ্যমগ্রাম ইউনিট সম্পাদিকা সীমা মিত্র, ইউনিট সদস্যা বেবী ঘোষ, ইউনিট সভানেত্রী মৈত্রেয়ী বিশ্বাস সহ ইউনিয়নের জেলা নেত্রীবৃন্দ জয়শ্রী দাশ ও অর্চনা ঘটক।

... নারী শ্রমিক কনভেনশন

সাতের পাতার পর

এ আই সি সি টি ইউ-র রাজ্য সহ-সভাপতি কমরেড তেনমোজি। কনভেনশনের উদ্বোধন করেন এ আই সি সি টি ইউ-র তামিলনাড়ু রাজ্য সাধারণ সম্পাদক কমরেড টি শংকর পাণ্ডিয়ান। এ আই সি সি টি ইউ-র পক্ষে বক্তব্য রাখেন রাজ্যের উপ-সাধারণ সম্পাদক কমরেড ভুবনেশ্বরী। শতাধিক নারী শ্রমিক উপস্থিত ছিলেন শ্রোতাদের আসনে।

কনভেনশন এই প্রস্তাব গ্রহণ করে যে, গৃহীত দাবিগুলো জোরের সাথে তুলে ধরে তামিলনাড়ু রাজ্যজুড়ে আন্দোলন সংগঠিত করা হবে।

১৩ আগস্ট
কাশীপুর-বরাহনগর
গণহত্যা দিবস
স্মরণ কর্মসূচী
সিঁথি মোড়
সকাল ৯টা

সি পি আই (এম এল) পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির পক্ষে মুদ্রক ও প্রকাশক কার্তিক পাল কর্তৃক ক্যালকাটা গ্রাফিক প্রাইভেট লিমিটেড, ৩এ মানিকতলা ইণ্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেট, উল্টোডাঙ্গা, কলকাতা-৫৪ হইতে মুদ্রিত ও ২১/১/১ ক্রীক রো, কলকাতা-১৪ হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক ঃ অনিমেষ চক্রবর্তী। ₹ ২ ফোন এবং ফ্যাক্স ঃ ২২৬৫ ১৬৭৯ e-mail : cpimlwb@yahoo.com//deshabrati@gmail.com